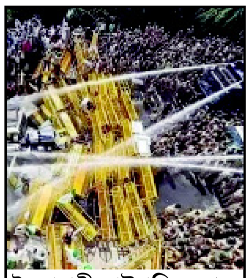
স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তি বনাম আমাদের অন্নদাতারা

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

১৬ ডিসেম্বর রাজভবন অভিযান

বিশেষ ষষ্ঠ ই-সংস্করণ, নভেম্বর, ২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ

ক্ষেতে কিষাণ, কলে মজুর জোট বাঁধো, তৈরি হও

২৬ নভেম্বর অভূতপূর্ব সফল সাধারণ ধর্মঘট

অভূতপূর্ব ধর্মঘটে দেশের বর্তমান কর্পোরেটসেবী সরকারকে হুঁশিয়ারি দিল শ্রমিক-কৃষক ক্ষেতমজুর, ছাত্র-যুব, মহিলা সহ দেশের সমগ্র অংশের মেহনতী জনগণ। আক্ষরিক অর্থেই মোদী সরকারের নিদারুণ শোষণ বঞ্চনা স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমজীবি জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াই রচনা করলো এক নয়া ইতিহাস। ২৫ কোটি মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আওয়াজ উঠলো 'এক দেশ এক লড়াই, এক দেশ, এক ধর্মঘট'।

১৯৯১ সালে দেশে উদার অর্থনীতি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যে ২০টি সর্বভারতীয় ধর্মঘট হলো, এদিনের ধর্মঘট ছিল তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব সহ ১৫টি রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট কার্যত বনধের চেহারা নেয়। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন এবং কৃষক-ক্ষেতমজুরদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির ৭ দফা দাবিতে এই ধর্মঘটের আহ্বান ও প্রচার এতটাই সুতীব্র ছিল যে বহু জায়গায় বিশেষ করে বন্দরে, কয়লাখনিতে ২৫ নভেম্বর রাত থেকেই ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। রাতের শিফটের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি। দেশের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলে এদিন মেশিনের চাকা ঘোরেনি। কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, দিল্লীর শিল্প এলাকায় ধর্মঘট হয়েছে সর্বাত্মক। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বড় আকারে ধর্মঘট হয়েছে। হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিকস, ভেল, বি ই এল বন্ধ ছিল। বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র পুরোই বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা, চেন্নাই, তুতিকোরিন, কোচিন, মুম্বাই, ভাইজাক, পারাদীপ বন্দরে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি। ভাইজাগ, সালেম, বোকারো সহ ইস্পাত শিল্প বন্ধ ছিল। অর্ধেক রাজ্যে রাস্তায় পরিবহন নেই, সড়ক-রেল অবরোধ চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জরুরি বিভাগ ছাড়া বিদ্যুৎক্ষেত্রের শ্রমিকরা কাজে যোগ দেননি। টেলিকমে ছিল প্রায় সর্বাত্মক ধর্মঘট। ডাক ব্যবস্থা অচল করে রেখেছিলেন কর্মীরা। প্রায় সমস্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘটে অংশ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

নির্বাচন কমিশনকে সংগঠনের পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ৬৬/২০ তারিখ ঃ ১৫/১২/২০২০

মাননীয় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক,
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় ঃ নির্বাচন কর্মী হিসাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পূর্ণ নিরাপত্তাবিধান ও নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে।

মহাশয়,

আপনি নিশ্চিত জানেন যে, রাজ্যে অবাধ, গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালন করার ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এক ঐতিহ্যবাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বহুবিধ ঝুঁকি নিয়েই তাঁরা সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে দৃষ্টান্তযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন।

কিন্তু সাম্প্রতিককালের নির্বাচনগুলিতে রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা নির্বাচন কর্মী হিসাবে প্রায়শই ভয়াবহ ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষতঃ নির্বাচন কর্মী হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা ও স্বীকৃত প্রশাসনিক বিধিবিধান মেনে মর্যাদার সাথে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে লাঞ্ছনা, হয়রানি, দলবদ্ধ শারীরিক হেনস্থা, ভীতি প্রদর্শন, অসহনীয় মানসিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ এমনকি জীবনহানির মতো ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নির্বাচন কর্মীদের পরিবার পরিজনেরাও তীব্র মানসিক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার শিকার হচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের বিধিবদ্ধ সুরক্ষা কবচগুলি পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কতগুলি বিষয় সম্পর্কে আমরা এখনই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আগামী নির্বাচনপর্বে সে সম্পর্কে যথোপযুক্ত ও কাঙ্খিত প্রশাসনিক ও নির্বাচনী বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাবলী গ্রহণের জন্য দাবি জানাচ্ছি।

(ক) নির্বাচনকর্মী হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বস্তরের কর্মীদের জীবনের পরিপূর্ণ নিরাপত্তাবিধান ও মর্যাদার সাথে নির্বাচনী বিধি মেনে কাজ করার সুযোগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত গাইড লাইন কঠোরভাবে মেনে নির্বাচন কেন্দ্রগুলির (পোলিং স্টেশন) পরিকাঠামো আদর্শস্থানীয় হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

(গ) সমগ্র নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে বিশেষতঃ পরিকাঠামো পরিচালনা, তদারকি ও বিবিধ দায়িত্ব প্রতিপালন (ভোটার তালিকা সংশোধন, প্রশিক্ষন, ভোটগ্রহণ ইত্যাদি) ও অন্যান্য কাজগুলি কেবলমাত্র স্থায়ী সরকারী কর্মীদের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে যাতে দায়িত্ব পালন ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা যায়।

(ঘ) পোস্টার ব্যালট, ই. ডি. ভোট ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ স্বচ্ছ ও কঠোরভাবে নিয়মমাফিক করতে হবে।

(ঙ) সমগ্র নির্বাচন অবাধ, গণতান্ত্রিক, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া প্রযোজ্য বিধি ও বিধানগুলি কঠোরভাবে কার্যকরী করতে হবে।

আশা করি সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি এ ব্যাপারে সম্যক ও সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণে আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,
বিজয়শংকর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

৮ ডিসেম্বর ২০২০

সফল হলো কৃষকদের ডাকা ভারত বন্ধ

দিল্লির রাজপথ থেকে ডাক দিয়েছিলেন দেশের অন্নদাতা কৃষকরা, সেই ডাকে সাড়া দিলেন আপামর ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষ। ৮ ডিসেম্বর ২০২০ নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লীর রাজপথে অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ কৃষকদের আহ্বত দেশজোড়া ধর্মঘট তৈরি করল এক নয়া নজির। গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ দেশের শাসকশ্রেণীর কাছে পৌঁছে দিলেন বার্তা—কৃষকদের হার না মানা এই লড়াইতে পাশে আছে গোটা দেশ। এ লড়াই গোটা দেশের কৃষক সমাজের লড়াই, মেহনতীদের লড়াই।

কৃষক বিরোধী তিনটি কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে ২৬ নভেম্বর দেশজোড়া ধর্মঘটের দিন থেকেই দিল্লি সীমান্ত অবরুদ্ধ করে খোলা আকাশের নিচে বসে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। ২৬ নভেম্বর দেশজোড়া ধর্মঘটের অন্যতম দাবি ছিল নয়া কৃষি আইনসমূহ বাতিল করতে হবে। কিন্তু গোটা দেশের মেহনতী জনগণ একযোগে ধর্মঘট সফল করা সত্ত্বেও দেশের সরকারের টনক নড়েনি। তাই কৃষকেরা তাদের হক ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে অগ্রাহ্য করেই তারা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছেন। দেশের বর্তমান সরকার প্রথমে আলোচনা নিয়ে শর্ত দিলেও পরবর্তীতে শর্ত ছাড়াই আলোচনা করা হয়, কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসু না হওয়ায় দেশের অন্নদাতারা একযোগে ৮ ডিসেম্বর গোটা দেশে হরতালের ডাক দেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে এই ধর্মঘট বানচাল করার চেষ্টা হলেও গোটা দেশের শ্রমিক কৃষক-মেহনতী মানুষ কৃষকদের দাবির প্রতি সমর্থনে এগিয়ে আসেন। কৃষকদের এই হার না মানা আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে ধর্মঘটে শামিল হন। ভোর থেকে শুরু হওয়া হরতাল শেষ হয়েছে সন্ধ্যা নামার পরে। ২২ রাজ্যে ধর্মঘট পালিত হয়েছে প্রতিরোধের মেজাজে। অনেক রাজ্যে পুরো বনধ, কোথাও সড়ক পথ, যানবাহন চলেনি, দোকানপাট, বাজার বন্ধ, দেশের অর্ধেক জাতীয় সড়ক ছিল অবরুদ্ধ। গ্রাম ভারতের রাস্তায় এদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে নেমেছিলেন প্রতিরোধের মেজাজে। বহু রাজ্যেই শিল্পাঞ্চল ছিল স্তব্ধ, শহরগুলিতে ছিল মিছিল ও অবরোধের ঢেউ।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

২৬ নভেম্বর, ২০২০

সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের অভিনন্দন জানালেন সাধারণ সম্পাদক

গত ২৬ নভেম্বর ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আহূত এবং বিভিন্ন জাতীয় ফেডারেশন সমর্থিত দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে আমাদের দেশে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পরে এটি ছিল ২০তম সাধারণ ধর্মঘট। শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ এবং ব্যাপ্তির নিরিখে এবারের ধর্মঘট, অতীতের সমস্ত ধর্মঘটের সাফল্যকে ছাপিয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ২৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ এই ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ও তার প্রেক্ষিতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, কৃষক সমাজ এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে সংহতি মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল এবং কোনো কোনো রাজ্যে গ্রামীণ বনধের কর্মসূচীও তাঁরা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, সাধারণ ধর্মঘটের কেন্দ্রীয় সাত দফা দাবির অন্যতম দাবি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার দাবি। আবার এই একই দাবি নিয়ে কৃষক সমাজ গত আগস্ট মাস থেকে লাগাতার কর্মসূচী প্রতিপালন করার পর, সাধারণ ধর্মঘটের ঠিক আগের দিন দিল্লি সংলগ্ন রাজ্যগুলি থেকে দিল্লি অভিযানের ডাক দেয়। এক কথায়, শ্রমিক-কৃষক সহ সমগ্র মেহনতী মানুষের ঐক্যের দিনলিপি রচিত হয়েছিল ২৬ নভেম্বর। এই সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী মানুষ যেমন ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরেও এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

এই প্রচার পরিকল্পনার সর্বোতচ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই স্বাধীনোত্তর ভারতে আপামর জনগণের পাশাপাশি নতুন ইতিহাস রচনায় সাক্ষী থাকলেন রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

এক নতুন ডিসকোর্সের পথে ভারতের রাজনীতি

২০১৪ এবং ২০১৯, পাঁচ বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দু'টি লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ের ফলে, গণমাধ্যমের বৃহদাংশের পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে জনমানসে এমন একটা ধারণা তৈরি করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা কর হচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ও তাদের নেতা শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী বর্তমান সময়ে ভারতের রাজনীতিতে এক অপ্রতিরোধ্য এবং অবিকল্প শক্তি ও ব্যক্তি হিসেবে উঠে এসেছে ও এসেছেন। যদিও গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ নামে পরিচিত গণমাধ্যমের এই সুরে প্রচারে, গণতন্ত্রের মূল মর্মবস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ গণতন্ত্রের সজীবতা নির্ভর করে তার মূল মর্মবস্তুর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের ওপর। আর এই মূল মর্মবস্তুটি হল, 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তা, সক্রিয় কার্যক্রম এবং সুরক্ষিত অধিকারের ওপর। জীবন ও জীবিকার অভিজ্ঞতায় জারিত এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির ভারসাম্যমূলক অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা শক্তির সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং সেই দল বা গোষ্ঠীর নীতিসমূহের মুখ্য প্রচারক হিসেবে নেতৃত্ব উঠে আসেন। নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা, ভাবমূর্তি, সংবেদনশীলতা ইত্যাদির সংমিশ্রণে জনমানসে জনপ্রিয় নেতার ছবি গড়ে ওঠে।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু গণতন্ত্র সম্মত উল্লিখিত পথে ভারতীয় জনতা পার্টি বা ঐ দলের নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদী জনমানসে স্থান পাননি। শুরু থেকেই কৃত্রিম প্রচারের আবহ গড়ে তুলে, বাস্তবতারহিত একটি ধারণাকে জনমানসে আরোপ করা হয়েছে। আবার এটা বললেও সবটা বলা হয় না। শুধুমাত্র ভ্রান্ত ও কৃত্রিম ধারণাকে জনমানসে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, তাকেও আর্টিফিসিয়াল প্রোপাগাণ্ডার ছাতা দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এটা অনস্বীকার্য যে, অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই তা সম্পন্ন হয়েছে। একথা ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদী ও দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে নরেন্দ্র মোদীকে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের নেতা হিসেবে 'প্রোজেক্ট' করে। এই বিষয়টি সম্পূর্ণতই একটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং তা নিয়ে বাইরে থেকে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দলের নেতা হিসেবে সামনে নিয়ে আসা হলো না, একই সাথে তাঁকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও 'প্রোজেক্ট' করা হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রোজেকশনের কাজটা খুবই সুচতুর ভাবে করা হলো এমন একটা সময়ে যখন তৎকালীন ক্ষমতাসীন ইউ পি এ-২ সরকারের বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রী-আমলাদের একাধিক দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছে এবং জনসমাজের অভ্যন্তরে খুব স্বাভাবিকভাবেই এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, এক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি এবং বিকল্প বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে মানুষের সামনে হাজির করার সেটা ছিল আদর্শ সময়। প্রকৃত গণতন্ত্রের অনুশীলন কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যেই 'বিকল্প'-এর অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়। কিন্তু সেই আদর্শ বিকল্প উঠে আসতে পারতো, ইউ পি এ-২ সরকারের বিবিধ দুর্নীতি সহ সামগ্রিক নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সমবেত করে আন্দোলন পরিচালনা ও সেই আন্দোলনকে নেতৃত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্রে এই পথে 'বিকল্প' নির্মাণ, শুধু ব্যক্তি বা দল নয়, বিকল্প কর্মসূচী ও নীতিরও সন্ধান দেয়। অথচ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে এই পথে বিকল্পের নির্মাণ একেবারেই হলো না। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোটের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট কেবলমাত্র তাদের সর্বভারতীয় শক্তি বিন্যাসের তকমাটিকে ব্যবহার করেই নিজেদের বিকল্প হিসেবে হাজির করল। ইউ পি এ জোটের নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা তো তাদের ছিলই না, বরং ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা এন ডি এ জোটও ছিল সমদোষে দুষ্ট। এমনকি বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গা সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বুকে সরাসরি ছুরিকাঘাতের কালি মাখা ছিল ঐ জোটের ভাবমূর্তি।

তাই 'বিকল্প' শব্দটির মতো সাধারণভাবে যে ইতিবাচক সম্ভাবনা যুক্ত থাকে, এক্ষেত্রে তা আদৌ ছিল না। স্বভাবতই এই জোটকে ঘিরে মানুষের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাকে আড়াল করার জন্যই আর্টিফিসিয়াল প্রোপাগাণ্ডার ওপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করা হলো। ঐ প্রচারের মূল সুর ছিল, ২০১৪-র এন ডি এ জোট একটি ফ্রেস জোট, যার সাথে পূর্ববর্তী এন ডি এ জোটের কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই।

ফ্রেশ জোটের কনসেপ্টটিকে জনমানসে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য প্রয়োজন ছিল ফ্রেশ মুখের। এই ফ্রেশ মুখ হিসেবেই প্রজেক্ট করা হয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে। অথচ নরেন্দ্র মোদী এন ডি এ জোটের তো নয়ই, এমনকি ভারতীয় জনতা পার্টিরও জাতীয় স্তরের নেতা ছিলেন না। ইউ পি এ-২ সরকারের দুর্নীতি ও আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সমবেত করে আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করার মধ্য দিয়ে তিনি সহজাত জাতীয় নেতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাও নয়। একটি অঙ্গরাজ্য থেকে তুলে এনে তাঁর গায়ে জাতীয় নেতার পোষাক পরানো হলো। অনেকটা সুপার ইমপোজ ছবির মতো। এই ছবিটাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে এমন অনেক কথা বলা হলো, যার সাথে জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতার কোনো সম্পর্কই নেই। যেমন বলা হলো, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতি। শারীরিক দিক থেকে বলবান হলেই কি নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হওয়া যায়? তাই যদি হবে, তা হলে ছোটখাটো চেহারার একজন কৃশকায় মানুষ ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন কিভাবে? শ্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে এই পোস্ট-ট্রুথ প্রচারের অপর দিকটি হলো, প্রকৃত বিষয়গুলিকে সযত্নে আড়ালে রাখা। যেমন, তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালেই ২০০২ সালে গুজরাটে সংখ্যালঘুদের গণনিধন সংগঠিত হয়েছিল। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী তখনই একদিকে মানব উন্নয়ন সূচকে গুজরাটের ক্রম অবনমন ঘটেছিল, অপরদিকে গৌতম আদানির মতো একজন গুজরাট কেন্দ্রীক মাঝারি মাপের শিল্পপতি সম্পদের সোপান বেয়ে দেশের একদম প্রথম সারির বৃহৎ শিল্পপতিতে পরিণত হয়েছিলেন।

গুজরাটের প্রকৃত চিত্র যদি তুলে ধরা হতো, তাহলে আগামী দিনে সারা দেশের সামনে কী বিপদ আসতে চলেছে, তা বুঝতে জনসাধারণের খুব বেশি অসুবিধা হতো না। কিন্তু কর্পোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া প্রচার কৌশলে একজন কর্পোরেটের সেবাদাস গণহত্যার নায়ককে 'মসীহা' হিসেবে হাজির করলো। এর ফল যা হবার তাই হয়ে চলেছে গত ছ'বছরে।

গণতন্ত্রকে তামাশায় পরিণত করার এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা যে সাধারণ মানুষ একেবারেই ধরতে পারেনি তা নয়। দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের স্বার্থে দেশীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে নয়া উদারবাদের নির্বিচার প্রয়োগের বিরুদ্ধে যেমন সাধারণ মানুষ এককাট্টা হয়ে লড়াই করেছেন, তেমনই বিভাজনমূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির (এন পি আর, সি এ এ, এন আর সি) বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সময়ে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এর ফলে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্মিত শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্টিফিসিয়াল জনপ্রিয়তায় সময়ের সাথে সাথে ভাঁটার টানও শুরু হয়েছিল। এমনকি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে শুরু করেছিল। ২০১৫-২০১৮ এই সময়পর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তথাকথিত মোদী ম্যাজিকও মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাকপর্বে পুলওয়ামায় সেনাবাহিনীর কনভয়ে বিস্ফোরণ ও চল্লিশজন জওয়ানের মৃত্যু এবং তৎপরবর্তীতে বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে কেন্দ্র করে এক উগ্র জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স তৈরি করা হলো, যা দ্রুত পূর্ববর্তী পাঁচ বছর ধরে নির্মিত রুটি-রুজি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন বিরোধী লড়াইয়ের ডিসকোর্সটাকেই পাল্টে দিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শ্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য এবং ক্ষমতায় রেখে দেওয়ার জন্য গণতন্ত্রকে অন্তর্বস্তুগত দিক থেকে যতই দুর্বল করার চেষ্টা করা হোক না কেন, এর শিকড় এতটাই গভীরে প্রোথিত, যে নিরঙ্কুশ প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বলে এর কণ্ঠরুদ্ধ করার চেষ্টা হলেই জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনার একটা 'ব্যাকল্যাশ' তৈরি হয়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আরোপিত জরুরি অবস্থার সময়েও ঘটেছিল, নরেন্দ্র মোদী সরকারের দ্বিতীয় পর্বেও তা ঘটতে শুরু করলো।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বি জে পি জোট বর্ধিত শক্তি নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে, কর্পোরেটপন্থী ও হিন্দুত্ববাদী উভয় কর্মসূচীরই দ্রুততর প্রয়োগ ঘটানো শুরু করে। কিন্তু এবারেও জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনার 'ব্যাকল্যাশ'-এর মুখোমুখি হতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। বিশেষত, এন পি আর, সি এ এ, এন আর সি বিরোধী আন্দোলন এবং ৮ জানুয়ারি, ২০২০ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ছিল ঐ ব্যাকল্যাশের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। যদিও কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত পরিস্থিতি এর ধারাবাহিকতার সামনে বড় বাধা হিসেবে হাজির হয়। সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা, লকডাউন পর্বে সম্পূর্ণ গৃহবন্দী থাকার সরকারী নির্দেশিকা এবং পর্যায়ক্রমিক 'আনলক' পর্বেও স্বাস্থ্যবিধির কারণে সভা সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি গড়ে ওঠা ব্যাকল্যাশের ঢেউকে অনেকটাই স্তিমিত করে দেয়। সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির খাঁচায় সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন বন্দী হয়ে যাওয়ার ফলে, শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকারের সম্ভবত একটা ধারণা হয়েছিল যে এই সময়টাই আম্বানি-আদানি সহ দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সেবার আদর্শ সময়। কারণ সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন না। আসলে শ্রী মোদীজী এবং তাঁর পরামর্শদাতারা 'সাবজেকটিভলি' বিদ্যমান পরিস্থিতির বিচার করেছেন। অর্থাৎ করোনা সংক্রমণজনিত বিধিনিষেধের কারণে, সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণেই তাদের এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু অবজেকটিভলি যদি তাঁরা পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতেন, তাহলে দেখতেন, কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়া 'লকডাউন' ঘোষণার ফলে খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর বিপর্যয়কর প্রভাব পড়েছে, বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থার ফলে সৃষ্ট জনমানসে বিপুল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু এই সমস্যা বা সঙ্কট নিরসনে যে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে বারংবার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরামর্শগুলিতে কর্ণপাত করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উপেক্ষার মনোভাব জনমানসে জমে থাকা ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে।

কর্পোরেট লবির প্রতি এই সরকারের দায়বদ্ধতা এতটাই যে, শুধুমাত্র ধূমায়িত গণঅসন্তোষকেই তারা উপেক্ষা করেনি, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংসদকেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কার্যত উপেক্ষা করা হয়েছে। শ্রম আইনের সংশোধন ও কৃষি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রশ্নে সংসদকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের সুযোগই দেওয়া হয়নি।

এইসব কিছুর সম্মিলিত ফল হলো, ২০১৯-এ পুলওয়ামা ও বালাকোট কেন্দ্রীক সুকৌশলী প্রচার যে ডিসকোর্সটিকে জনমানস থেকে স্থানচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছিল, তা পুনরায় জনমানসে ফিরে এসেছে। বিহারের বিধানসভা নির্বাচন, ২৬ নভেম্বরের সাধারণ ধর্মঘট এবং দিল্লীর বুকে এক পক্ষকাল ধরে চলা লাগাতার কৃষক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে এই ডিসকোর্সটি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। প্রাক লকডাউন পর্বে নাগরিক পঞ্জী কেন্দ্রীক যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনের কারণে যা প্রত্যাহৃত হয়েছে, সেই আন্দোলন যদি পুনঃসংগঠিত হয়ে বর্তমান ডিসকোর্সটির সাথে যুক্ত হয়, তাহলে তা কর্পোরেট সেবী ও হিন্দুত্ববাদী এই দ্বি-মুখী দানবের বিরুদ্ধে এক কার্যকরী প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে উঠে আসবে। যা গণতন্ত্রের পরিসরকে সম্প্রসারিত করে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তবে শ্রমজীবী মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে, আবারও যেন পুলওয়ামা বা বালাকোটের মতনো ঘটনার ভিত্তিতে বর্তমান ডিসকোর্সটির অকাল মৃত্যু ঘটানো না হয়। □

১৮ ডিসেম্বর, ২০২০

শোক সংবাদ

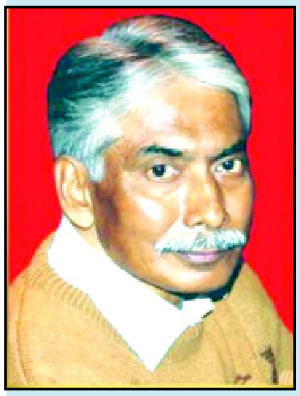

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নদীয়া জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক কুমার কুণ্ডু গত ২ নভেম্বর, ২০২০ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর।

কমরেড অশোক কুমার কুণ্ডু ১৯৫৪ সালে ১৬ অক্টোবর নদীয়া জেলার রানাঘাট শহরের সাহেব বাড়ি হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম রানাঘাট শহরের মাতুলালয়ে হলেও কৈশোর থেকে পরবর্তী জীবন কৃষ্ণনগর শহরেই কেটেছে। প্রাথমিক স্তরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে ঐ স্কুল থেকেই ১৯৭২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৭৫ সালে কৃষ্ণনগর কমার্স কলেজ (অধুনা দ্বিজেন্দ্রলাল মহাবিদ্যালয়) থেকে স্নাতক হন। ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন নদীয়া জেলার হাসখালি ব্লকের বগুলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রামনগর উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেল) পদে কাজে যোগদান করেন। কর্মজীবনের প্রথম থেকেই ওয়েস্ট বেঙ্গল নন মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে মতাদর্শগতভাবে পরিশীলিত করেছেন এবং কর্মী থেকে নেতৃত্বের পদে উন্নীত হয়েছেন। ১৯৯০ সালে হাসখালি ব্লক থেকে কৃষ্ণনগরে উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণ ও ২০০৫ সালে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের করণে বদলী হয়ে আসেন।

হাসখালি ব্লকে থাকাকালিন নিজ সমিতির ব্লক সম্পাদক ও ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জেলা কেন্দ্রে অবস্থানের সুবাদে নিজ সমিতি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল নন মেডিকেল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের জেলার যুগ্ম সম্পাদক ও ২০০৪ সালে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক ও পরবর্তীতে সহ সম্পাদক পদে উন্নীত হন এবং সততা ও দক্ষতার সাথে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। নিজ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

২০১১ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর তাঁকে রানাঘাট মাধব দত্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন প্রত্যন্ত এলাকা নতুনপাড়া উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলি হতে হয়। ২০১৪ সালে অক্টোবর মাসে চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেন। আমৃত্যু জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও নিজ সমিতির জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। কর্মী, সদস্য সহ সাধারণ মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার ছিল অনুকরণীয়।

১৯৯৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমতি শ্বেতা কুণ্ডুর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান অর্কপ্রভ কুণ্ডু। গত ৪ ডিসেম্বর জেলা সংগঠন দপ্তরের দিলীপ চক্রবর্তী সভাকক্ষে কমরেড অশোক কুমার কুণ্ডুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। □

ধর্মঘটের প্রচারে অনুষ্ঠিত পথসভা

গত ১১ নভেম্বর ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর '২০ সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা এবং লবনহ্রদের বৈশাখী মোড়ে দুটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১.৩০টা থেকে অনুষ্ঠিত এই পথসভায় ভালো সংখ্যক সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ অন্যান্য অংশের শ্রমিক-কর্মচারীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈশাখী মোড়ের সভায় মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ বি পি টি এ-র নেতা সমর চক্রবর্তী এবং কে এম ডি এ সংগঠনের গৌতম মজুমদার। হাজরা মোড়ের পথসভায় মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্ব প্রদীপ দত্ত এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব বাবলু ঘোষ।

পথসভায় বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা কোন পরিস্থিতিতে এই অতিমারির সঙ্কটের সময়েও শ্রমিক কর্মচারীরা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হচ্ছেন তারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। সবাইকে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান সভার বক্তাগণ। □

দেশজ সম্পদ বিক্রির অভিযান বন্ধ হোক

মানস কুমার বড়ুয়া

১৯৯১ সালে ভারতে পথ চলা শুরু করা নয়া উদার অর্থনীতির অন্যতম ফলাফল হিসাবে শুরু হওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াতে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নতৃেত্বে বি জে পি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। এই পর্বে 'স্ট্র্যাটেজিক সেল' সহ বেশ কয়েকটি গালভরা নামে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে সরাসরি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতি বছরেই বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে সরকার। চলতি আর্থিক বর্ষে (২০২০-২১) কেন্দ্রীয় বাজেটে ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা বিলগ্নীকরণের মধ্য দিয়ে সংগ্রহের প্রস্তাব আছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা সংগৃহীত হবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে। স্ট্র্যাটেজিক সেল-এর মধ্য দিয়ে সংগৃহীত হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা।

বর্তমান বছরের সাধারণ বাজেট পেশ করার পরপরই কোভিড অতিমারির মোকাবিলায় দেশে লকডাউন পর্ব শুরু হয়। সেই কারণে বিলগ্নীকরণের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু অতিমারির পরিস্থিতিতে টেলিভিশনে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রতারণাপূর্ণ ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা এবং এরই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ৫ দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বেসরকারীকরণের বিষয়টি দেশবাসীর কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় রেলের বেসরকারীকরণ, ৪১টি কয়লা ব্লক বেসরকারী সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়া, মহাকাশের গবেষণা ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থার প্রবেশের অনুমোদন ইত্যাদি। হাস্যকর বিষয় হলো, এসব কাজ হচ্ছে 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান' (এ বি এ)-র নামে।

কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করা বা বেসরকারীকরণ করা কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলার এই জরুরি সময়ে কি খুব প্রয়োজনীয় ছিল? এর উত্তর নেই। ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদী ভিত্তি এইসব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বর্তমানে দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে কি? এর উত্তর খুঁজতে গেলে কিছু পরিসংখ্যানে চোখ বোলানো জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সালের প্রতিবেদনের তথ্যে দেখা যাচ্ছে ২০১৮-১৯ সালে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা ছিল ৩৩৫টি। এর মধ্যে ১০টি মহারত্ন, ১৪টি নবরত্ন, ৭৩টি মিনিরত্ন-১ এবং ১২টি মিনিরত্ন-২। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পেইড আপ ক্যাপিটালের পরিমাণ ২০১৭-১৮ সালে ছিল ২.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৮.৬ শতাংশ। সর্বমোট পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সালে ছিল যথাক্রমে ১৪.৩১ লক্ষ কোটি টাকা ও ১৬.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মোট আয়ের পরিমাণ ২০১৭-১৮ সালে ছিল ২০.৩২ লক্ষ কোটি টাকা যা

২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ। নিট মুনাফার পরিমাণ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সালে ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং ১ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। এক বছরে নিট মুনাফা বৃদ্ধির হার ১২.২৫ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির সংরক্ষিত মজুতের পরিমাণ উক্ত দুই বছরে ছিল যথাক্রমে ৯.২৬ লক্ষ কোটি টাকা ও ৯.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ। নিট মুনাফার পরিমাণ ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সালে ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা এবং ১ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। এক বছরে নিট মুনাফা বৃদ্ধির হার ১২.২৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জমার পরিমাণ ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৩.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩.৬২ লক্ষ কোটি টাকা। উক্ত দুই বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.২২ লক্ষ কোটি টাকা ও ৬.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা থেকে মুনাফা বৃদ্ধি সহ সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক। একথা মনে রাখা প্রয়োজন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি এই সদর্থক ভূমিকা পালন করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চূড়ান্ত অসহযোগিতামূলক আচরণ সত্ত্বেও।

'আত্মনির্ভর অভিযানে'-র নামে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির সাথে দেশের বা দেশবাসীর কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। এই কাজ করা হচ্ছে নয়া উদার আর্থিক নীতির শর্ত পূরণের জন্য। যে নীতির অন্যতম শর্ত হলো রাষ্ট্রের ভূমিকা ন্যূনতম করা অথবা একদম তুলে দেওয়া। ১৯৯১ থেকে এই প্রক্রিয়া জারি আছে। নরেন্দ্র মোদীর দু'দফায় তা মাত্রাহীন রূপ নিচ্ছে। বিলগ্নীকরণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আধুনিকীকরণ না করে মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর দেশের শিল্পপতিদের আয়কর ও কোম্পানি কর বাবদ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দেওয়ার ফলে যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে তা পূরণ করতে জাতীয় সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না কোনো ক্ষেত্র। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রেল ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের অংশ হিসাবে ১৫১টি রুটে ট্রেন চলাচল বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের ৪১টি কয়লা খাদান থেকে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নিলামের সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এর বিরুদ্ধে কয়লা শিল্প শ্রমিকদের সবক'টি ট্রেড ইউনিয়ন ২-৪ জুলাই তিনদিন ব্যাপী ধর্মঘট করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণের ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিলগ্নীকরণের উদ্যোগের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

আলোচনা সভা

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ মালদা জেলা সংগঠনের আহ্বানে শিক্ষামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়ঃ ৯২-এর কলঙ্কিত অধ্যায় ও বর্তমান ভারত, আলোচকঃ রতন ভাস্কর। সভা পরিচালনা করেন প্রদীপ বাঘিরা (জেলা সভাপতি)।

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে বহুমাত্রিক প্রচার

ফেসবুক লাইভে সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক

দার্জিলিং জেলায় সুদূর গরুবাথান ১ব্লকে ধর্মঘটের প্রচার

মালদা জেলায় আলোচনা সভা

ধর্মঘটের সমর্থনে ট্যাবলো প্রচার

রক্তদান শিবির

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির সফলভাবে শেষ হলো। এই রক্তদানের কর্মসূচিতে ১০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এই মহতী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানীয় ডঃ অম্বিকেশ মহাপাত্র। □

করোনা সংক্রমণ কেড়ে নিল যেসকল সাথীদের প্রাণ তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শোকজ্ঞাপন

হাওড়াঃ কমরেড বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (হাওড়া জেলা, পেনশনার্স সমিতি), কমরেড স্বপন রক্ষিত (প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, হাওড়া জেলা)

দার্জিলিংঃ উপেন বেহুরিয়া (যান্ত্রিক তরিৎ সমিতির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক)।

পূর্ব মেদিনীপুরঃ বিল্বপদ নাথ (সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি), দিলীপ বাগ (পেনশনার্স সমিতি), উমা সামন্ত (নার্সিং কর্মচারী)।

পশ্চিম মেদিনীপুরঃ খোকন সিং (গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতি), শ্রুতিনাথ দাস (ডব্লু বি এম ও এ), বাসুদেব সোরেন (ডব্লু বি এম ও এ), ভবেশ গিরি (১২ই জুলাই কমিটির ..... মহকুমা আহ্বায়ক)।

মালদাঃ পার্থ সেনগুপ্ত (ডব্লু বি এম ও এ), মানিক মাঝি (পেনশনার্স সমিতি), অসিত দাস (পেনশনার্স সমিতি), দেবাশীষ চক্রবর্তী (পেনশনার্স সমিতি), সুজিত মৈত্র (চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী), রাজা পাশোয়ান (চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী)। □

বাংলার সংস্কৃতি জগতের মহীরূহ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

দীর্ঘ লড়াই শেষে অভিযান থেমে গেল কিংবদন্তী অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। টানা ৪১ দিন নানা জটিল রোগের সাথে লড়াইয়ের পর ১৫ নভেম্বর দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। চলচ্চিত্র ও নাটকে অভিনয়, কবিতা রচনা, আবৃত্তি ও ছবি আঁকা প্রভৃতি সৃষ্টির নানা অঙ্গনে অনায়াস বিচরণ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে সামাজিক চেতনায় উজ্জ্বল জীবনবোধের পরিচয় রেখে ৮৫ বছর বয়সে তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। তিনি রেখে রেখে গেছেন স্ত্রী দীপা চট্টোপাধ্যায়, কন্যা পৌলমী ও পুত্র সৌগতকে। এদিন সন্ধ্যায় গান স্যালুট শেষে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

৫ অক্টোবর করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনি বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত তিনি অভিনয় করে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই প্রস্টেট ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। সপ্তাহখানেকের চিকিৎসায় তিনি করোনা মুক্ত হলেও, অন্যান্য নানা শারীরিক জটিলতা তৈরি হয় তাঁর। শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে শারীরিক প্রবল টানাপোড়েন চলে এবং চিকিৎসকরা তাঁকে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দিতে বাধ্য হন। এভাবে কখনো ভালো, কখনো মন্দের প্রহর শেষে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

বিশিষ্ট অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বামপন্থী নেতৃবৃন্দ শোকজ্ঞাপন করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। এছাড়াও শোকপ্রকাশ করেছেন শিল্প-সংস্কৃতি জগৎ সহ নানা অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

১৫ নভেম্বর দুপুরে বেলভিউ নার্সিংহোম থেকে প্রয়াত শিল্পী মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর গল্ফগ্রিনের বাসভবনে। সেখান থেকে মরদেহ আনা হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। তারপর মরদেহ নিয়ে এসে শায়িত রাখা হয় রবীন্দ্রসদনে। সর্বত্রই অগণিত মানুষ, শিল্পী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফুল, মালায় শ্রদ্ধা নিবেদনে করেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রবীন্দ্রসদন থেকে কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে শুরু হয় শোকমিছিল। করোনা মহামারি সংক্রমণের ভয়াবহ আবহে এদিনের এই শোকমিছিল ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাস্থ্যবিধিকে যথাসম্ভব মেনে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অগণিত মানুষ পা মেলান শোকমিছিলে।

প্রিয় অভিনেতার প্রতিকৃতি নিয়ে পথ হাঁটেন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ এবং তরুণ-তরুণীরা। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ শোকমিছিল পৌঁছায় কেওড়াতলা শ্মশানে। সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদয় গান স্যালুট জানানো হয় প্রয়াত বিশিষ্ট অভিনেতাকে। তারপর কন্যা, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনের উপস্থিতিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। এর মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি হয় বাংলা সংস্কৃতি জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল অভিযাত্রা। □

কোভিড পরিস্থিতিতেও দেশে বিদেশে নভেম্বর বিপ্লব উদ্‌যাপন

কুমকুম মিত্র

মানবমুক্তির ইতিহাসে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই দিনটি শুধু রুশ দেশেই নয়, সমস্ত দেশের ইতিহাসেই প্রতিবার এক যাদকুরী তাৎপর্য নিয়ে ফিরে এসেছে। নভেম্বর বিপ্লব এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছে। আজকের ইতিহাস বিমুখতার দিনেও নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস খুব বেশি করেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। বহু বছর ধরেই মানব সভ্যতার উন্নয়ন সাধনে এই বিপ্লবের যুগান্তকারী ও অভূতপূর্ব অবদান লক্ষ্যণীয় বিষয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই বিপ্লবের অনুপ্রেরণাতে কৃতিত্বের সাথে সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে এবং উন্নত পৃথিবীর জন্য মানুষের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই মানবতা বিরোধী ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ত শক্তি তথা হিটলারকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল এবং পৃথিবীজুড়ে উপনিবেশবাদেরও পতন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। সেই সময় এর ফলে কিছু পুঁজিবাদী দেশও বাধ্য হয় জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের তক্‌মা নিয়ে সেই দেশের মানুষদের কিছু কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে। সেই সময় মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আর এই আগ্রহের ঢেউ পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে ত্রাস হয়ে উঠলো, তাদের কাছে এই ঢেউকে স্তিমিত করা জরুরি হয়ে পড়লো।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতই প্রথম দেশ, যারা মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। এর সাথে সাথে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সিনেমার ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হয়। আইজেনস্টাইন বিশ্বের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেন সন্ত্রাস প্রযুক্তির। মোট কথা, আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিপক্ষে সফলভাবে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নই বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একই সাথে বিশ্বশান্তিও সুনিশ্চিত করেছিল।

২০২০ সালের মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী অন্য একটা আঙ্গিকে উপস্থিত হয়েছে। এমন এক সময়ে উপস্থিত হয়েছে, যখন বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন জীবিকার উপরে একটা দ্বিমুখী আক্রমণ নেমে এসেছে, কোভিড-১৯ মহামারি এবং তার পরবর্তী লাগাতার লকডাউন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে হাহাকার নামিয়ে এনেছে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরো গভীরে নিমজ্জিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে যখন পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নতুন করে ও পুনরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কিন্তু সাফল্যের সাথেই মহামারিকে রোধ করতে পেরেছে এবং তাদের অর্থনীতিকেও সচল রাখতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, গণতান্ত্রিক কোরিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আজ গোটা মানব সভ্যতার অস্তিত্ব যখন চ্যালেঞ্জের মুখে তখনই সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র ও নয়া উদার পুঁজিবাদের পার্থক্য। পৃথিবীর ইতিহাসে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণের মোকাবিলার পথ নির্দেশ করে গেছে মহান নভেম্বর বিপ্লব। যে বিপ্লব আজ গোটা বিশ্বজুড়ে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস। বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষের স্বার্থে যে সমস্ত লড়াই সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলছে তাতেও আত্মনির্ভরতার শক্তি যোগাচ্ছে এই বিপ্লব। নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার কোনো সমাধান হাজির করতে পারবে না, উল্টে সেটাকে আরো গভীরে টেনে নিয়ে যাবে।

একমাত্র সমাধান পুঁজিবাদের বাইরে গিয়ে—সেটা হলো সমাজতন্ত্র। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই কিন্তু সমাজতন্ত্রের স্বপ্নটা জেগে আছে। জেগে আছে চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, গণতান্ত্রিক কোরিয়া। এই করোনা পৃথিবীতে আবার সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বই অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাই গোটা বিশ্বে আবার সমাজতন্ত্রের ভাবনাগুলোই ফিরে ফিরে আসছে। এই নিরিখে এ বছরেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী দিবস। প্রথমেই মনে আসে রাশিয়ার নাম, সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয় হলেও সেখানের মানুষ এখনো এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজও এই দিনটি তাদের ছুটির দিন থাকে। মস্কো শহরের রেড স্কোয়ারসহ বিভিন্ন জায়গায় পতাকা উত্তোলন, প্যারেড, ফায়ার ওয়ার্কস, অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি, বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। মস্কোর রেডস্কোয়ারে সবাই লাল পতাকাসহ লেনিন ও স্তালিনের ছবিসহকারে র‍্যালি করেন, র‍্যালির শেষে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব Gennady Zyuganav এই বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও দেশের সমস্ত বিখ্যাত পোষ্টার ও যুবক-যুবতীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয় এবং আরো বিভিন্ন কালচারাল অনুষ্ঠান করে। এই দিনের সমস্ত অনুষ্ঠানই সোভিয়েত কালচারাল টেলিভিশনে ব্রডকাস্ট করা হয় যা সমস্ত মানুষ দেখে। কিউবা একটি ছোট্ট দেশ, কিন্তু তারাও গর্বের সাথে এই দিনটি উদ্‌যাপন করে ও করেছে। তারাও লাল পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। সুসজ্জিত মিলিটারি প্যারেড হয়, এছাড়া বিভিন্ন বিপ্লবী মুহূর্তের ডেমোস্ট্রেশন হয় এবং সরকারী কর্তাব্যাক্তিরা নভেম্বর বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। কিউবতেও এই দিনটি ছুটি থাকে। উল্লেখযোগ্য দেশ ভিয়েতনামের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ছুটির দিনটিকে উদ্‌যাপন করেন। হ্যানয়ের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান Ngayen Due Chung ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মূর্তিতে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বিভাজনের নতুন মোড়কের জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

ওরা যত বেশি পড়ে
তত বেশি জানে
তত কম মানে

হীরকরাজের যে সর্দার উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালা বন্ধ করতে এসেছিল, সে ঠিক এই আপ্তবাক্যই উচ্চারণ করেছিল। প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রে রূপকের মাধ্যমে সমাজে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। শিক্ষার আলোয় আলোকিত তরুণ সমাজের প্রতি সমাজপতিদের ভয়ের এর চাইতে সরল ও সঠিক উপস্থাপনা আর কী হতে পারে। আজকের দিনে তা সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

২০২০ সালের ২৯ জুলাই একতরফা ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দেশের জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া চূড়ান্ত করে। এই শিক্ষানীতি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করে ৩৪ বছরে নাকি দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা পাল্টে দেবে এতদিন ধরে চলে আসা শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে কোনো দেশেরই শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন আনতে হয়। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতা এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাই পরিবর্তন জরুরি। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই পরিবর্তন কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, কোন পথে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে হবে। কোনো স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশের শিক্ষানীতি হবে সর্বজনীন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে। নীতি হবে যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং আধুনিক। নতুন প্রজন্মের জ্ঞানের বিকাশ, অনুসন্ধিৎসু মনকে প্রসারিত করা, দক্ষতা ও উদ্ভবনী ক্ষমতা বৃদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য। মোদী সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছে তাতে এসবের বালাই নেই। হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক যেহেতু নিবিড় তাই পুঁজির স্বার্থে শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথকে প্রসারিত করা হয়েছে। একদিকে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট মুনাফার জন্য শিক্ষাকে পণ্যরূপে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অন্যদিকে আর এস এস'র বৈদিক হিন্দুত্বনির্ভর প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক শিক্ষাকে আশ্রয় করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি রচনায় শব্দচয়নে দারুন মুন্সিয়ানার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির শ্রষ্ঠারা ভীষণ আকর্ষণীয় শব্দচয়ন করে শিক্ষানীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতেই পারে, এই বর্তমান শিক্ষানীতি জাতীয় স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে, যা সময়োপযোগী এবং বাস্তবোচিত এই ধরনের নীতির খুবই প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে বিরামহীন চটকদারি প্রচারের যুগে সমাজের একটা বড় অংশ মুখবন্ধেই আকৃষ্ট হন। ভেতরের অন্তর্বস্তু যাচাইয়ের প্রাসঙ্গিকতাই হারিয়ে যায়। 'উত্তর সত্যের' যুগে এই চূড়ান্ত সত্যকে মাথায় রেখেই হয়তো তৈরি করা হয়েছে শিক্ষানীতির মুখবন্ধ। কিন্তু ক্রমশ যখন শিক্ষানীতির বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করে মুখবন্ধে ব্যবহার করা শব্দগুলির প্রায়োগিক দিক পর্যালোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়, তখনই শিক্ষানীতির ভেতরে ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে থাকা বর্তমান শাসকদলের সুপ্ত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রকট হয়ে ওঠে। এই শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যায় না গিয়ে শাসকশ্রেণীর প্রকৃত লক্ষ্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধ, যা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র।

প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল টোল / মাদ্রাসা কেন্দ্রীক। যা কিনা বহুলাংশে মৌলবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। ঔপনিবেশিক আমলের প্রারম্ভিক পর্বে কোম্পানি শাসনে প্রথমে ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে শিক্ষাখাতে বছরে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সর্বজনীন শিক্ষার কথা মেনে নেওয়া হয়। প্রাক ঔপনিবেশি শিক্ষা ব্যবস্থা কোম্পানির হাত ধরে মৌলবাদী তথা পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি লাভ করলেও কোম্পানির আমলে কালক্রমে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ ও শাসনতন্ত্রের যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। ১৮৩৫ সালে ঘোষিতহয় মেকলের শিক্ষানীতি। মেকলে বর্ণিত শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি জানা দেশীয় কর্মচারী তৈরি করা, যারা কোম্পানি ও সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে যোগসূত্রকারীএজেন্ট হিসাবে কাজ করবে। সুতরাং এখানে কোনো দ্বিমত নেই যে প্রাথমিকভাবে কোম্পানি সরকারের শিক্ষানীতি রচিত হয়েছিল তৎকালীন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কিছু সংখ্যক দেশীয় কর্মচারী তৈরি করার লক্ষ্যে। কারণ তখনকার দিনে ইংল্যান্ড থেকে ইংরেজি জানা কর্মচারী নিয়ে এসে কাজ করানো একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, অন্যদিকে সাধারণ ভারতীয়দের সাথে তারা সঠিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে ব্যর্থ হতেন, ফলে শাসন ও শোষণ উভয়ের স্বার্থই ব্যাহত হতো। সুতরাং তৎকালীন পরিবেশে বাজারের চাহিদা ছিল সস্তায় ইংরেজি জানা দক্ষ কর্মচারী তৈরি করা, যারা ভারতীয় বংশভূত হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকদলের পদলেহন করে চলবে।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেনি। আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধারন করে উদার আর্থিক নীতির মধ্যে প্রবেশ করেছে যা সর্বদাই বাজার সর্বস্য। ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বাজারের চাহিদা তার অভিমুখ বদলেছে। শিক্ষানীতিও বাজারের কথা মাথায় রেখে রচিত হয়েছে। বলা হয়েছে জ্ঞানের দরকার নেই, কাজের জগতে দক্ষতা অর্জন করলেই হবে। এই দক্ষতা অর্জন মানে ঔপনিবেশিক সময়কালে ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতা অর্জন নয়, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক তৈরি হওয়া। দক্ষ শ্রমিক হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত বাজারের চাহিদা এবং দক্ষ শ্রমিকই হচ্ছে একবিংশ শতকের মুনাফা ভোগীদের আসল পুঁজি। এই বাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই শিক্ষানীতির এক জায়গায় বলা হয়েছে যে এই দক্ষতা অর্জন করেই ছাত্র সমাজকে বাজারের উপযোগী হতে হবে। সে কারণেই স্কুল স্তর থেকেও ভোকেশনাল কোর্সের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ভোকেশনাল কোর্স কোনো নতুন বিষয় নয়, এটা আগেও ছিল ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক হবার উদ্দেশ্য একটা বিরাট অংশের ছেলেমেয়েকে স্কুল স্তর থেকেই নির্দিষ্ট পেশাগত কারিগরী বিদ্যার দিকে ঠেলে দিয়ে উচ্চ শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, এতে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হয়—প্রথমত সমালোচক প্রজন্ম তৈরি না হওয়া অর্থাৎ প্রশ্ন করার কৌতূহলী মনকে দমিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত সরকারি চাকরি প্রার্থীর সমস্যা কমিয়ে আনা।

জাতীয় শিক্ষানীতির যে মূল ১০টি বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে তার অন্যতম তিন বছর বয়সেই প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা প্রদান করা। শুনলে মনে হয় দারুণ উদ্যোগ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু যদি তলিয়ে দেখা যায় তাহলে প্রশ্ন জাগে কিভাবে এই কাজ সম্পন্ন হবে? তাহলে কি নতুন করে স্কুল তৈরি হবে? শিক্ষিত বেকারদের চাকরির নতুন রাস্তা তৈরি হবে? শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করানো হবে। সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া যায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বর্ধিত বেতন দিয়ে শিক্ষিকায় রূপান্তরিত করা হবে। কিন্তু গড়ে ৪৫০০ টাকা মাসিক বেতন পাওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির বা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে সমগ্র দেশে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ২০০টি। এর সাথে ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে যুক্ত করে দেওয়ার অর্থ পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের চিহ্নিত করে পুষ্টিদানের সামাজিক কর্তব্য থেকে সরিয়ে সরকারি দায়কে ঝেড়ে ফেলা। শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি, সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রাম অথবা শহরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলে বিপুল সংখ্যক শিশু সরকারী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টি ও সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্র থেকে বাদ যাবে।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন ৫+৩+৩ এই মোট ১১ বছরের শিক্ষা পদ্ধতি নাকি দেশের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। দেশে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ৫ বছর প্রাথমিক, ৫ বছর মাধ্যমিক এবং ২ বছর উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ ১২ বছরের পরিবর্তে ১১ বছর বিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে একই ধরনের বিষয় নিয়ে পড়তে হয়। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ৪টি বিভাগের যে কোনো একটি বিভাগ বেছে নিতে হয়। এর সাথে হয়তো কোথাও কোথাও একটি বিষয়কে ঐচ্ছিক হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। এই ব্যবস্থা চালাতে গিয়েই বিদ্যালয়গুলি গভীর সমস্যার মধ্যে পড়ে মূলত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকমণ্ডলী এবং ক্লাস রুমের অভাবে। নীতি আয়োগের উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী দেশের ২২টি রাজ্যের মাত্র ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী অনুপাত সঠিকভাবে রক্ষিত হয়। বাকি ৯টি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্যালয়েই এই অনুপাত ঠিক নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যথাক্রমে ৩১.৪ এবং ২৩.৯ শতাংশ শিক্ষক পদ শূন্য। সারা ভারতের মধ্যে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে। প্রতি ১০০ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীপিছু মাত্র ১.৫ জন শিক্ষক আছে। এই বাস্তবতায় প্যারা টিচার পদ তুলে দেওয়া হবে—এই ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে কি এদের সবাইকে পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হবে, নাকি ছাটাই করা হবে। এদের পূর্ণ শিক্ষক করা হলে প্রয়োজন যে অর্থ বরাদ্দের তার কোনো উল্লেখই নেই জাতীয় শিক্ষানীতিতে। বিভিন্ন বিভাগের বিষয় ইচ্ছেমতো চয়ন করার ব্যবস্থা করতে শূন্যপদ পূরণ করেও আরও বহু শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় তা কি আদৌ সম্ভব?

বর্তমানে দেশের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকরী করতে যে শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে আছে তাদের বিদ্যালয় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ৪ জন শিশুর মধ্যে ৩ জন শিশুই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেনি। এন এস এস ও রিপোর্ট বলছে ৬-১৮ বছর বয়সী ৪-৫ কোটি শিশু-কিশোর বিদ্যালয় প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এই শিক্ষানীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ডিজিটাল নার্সিং। এই শিক্ষানীতির ১.৬ প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে শিক্ষাদানের কর্মসূচী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণের কর্মসূচী মূলত ডিজিটাল মাধ্যমে করা হবে। যে দেশে ৭৭ কোটি মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, সেই দেশে ইন্টারনেট মারফৎ পড়াশোনা, বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অলিক কল্পনা ছাড়া আর কী হতে পারে। এই মুহূর্তে ভারতের ৫৫ হাজার গ্রাম মোবাইল পরিষেবার বাইরে। মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৩ শতাংশ মানুষের কাছে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছাতে পেরেছে। ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা বলছে দেশের ৬৬ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। তাদের ১৪.৯ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। শহরের ৩৪ শতাংশ বসবাসকারীর মধ্যে ৪২ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। দেশের সবচেয়ে গরিব ২০ শতাংশ পরিবারের মাত্র ২.৭ শতাংশ কম্পিউটার এবং ৮.৯ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায়। কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। কিন্তু ২০১৭-১৮ সালে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সমীক্ষা বলছে গ্রামের ১৪ শতাংশ ১-৮ ঘণ্টা, ৩৩ শতাংশ মানুষ ৯-১২ ঘণ্টা এবং ৪৭ শতাংশ মানুষ ১২ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ পায় না। আরও করুন অবস্থা অবশিষ্ট ৬ শতাংশ মানুষ কোনো বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আওতায় নেই। এই তথ্যকে যদি সত্যিই ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কিভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণ এবং ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত কর্মী এবং সহায়কদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব? আসলে ডিজিটাল মাধ্যমকে শিক্ষাদানের মূল মাধ্যমে রূপান্তরিত করার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সরকারী দায়িত্ব এড়াতে এবং শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার বৃদ্ধি করতে। এমনিতেই ভারতবাসীকে ধনী এবং দরিদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে স্বাধীনতার সময় থেকেই। বর্তমানে তা আরও তীব্র হয়েছে। এখন ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষার্থীদের নতুন করে বিভক্ত করার চেষ্টা, এর ফলে বিপুল অংশের দরিদ্র নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির সন্তানরাও শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে দূরে সরে যাবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি দ্রুতলয়ে কার্যকরী করার অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজি থেকে জনহিতকর সংস্থাকে উৎসাহ দান এবং সর্বোপরি ১০০টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ উন্মুক্ত করা। পশ্চিমী ধাঁচের অনুকরণে তৈরি এই নীতি আসলে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'র বাণিজ্যিক জগতে পৌঁছে দেবে, বঞ্চিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী।

স্বাধীনতার সময় থেকেই আমাদের দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের রাস্তা ধরে এগিয়েছে। স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতবর্ষে থেকে যাওয়া সব ভাষা, ধর্ম, জাতির মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে চলবে না। প্রত্যেক মানুষের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলবার এবং শিক্ষালাভের সমান অধিকার থাকবে। এই জন্যই ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং ঐক্যবদ্ধ আছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা আমাদের দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। এই ধারণার মূলে আঘাত করে দেশের মানুষের ঐক্যকে বিপজ্জনক কিনারায় নিয়ে যেতে চাইছে দেশের শাসকদল।

দেশের মানুষ জাত-ধর্ম-ভাষা নিয়ে ঘৃণা, বিবাদ, সংঘাত ও দাঙ্গায় ব্যস্ত থাকুক আর সেই সুযোগে দেশের প্রাকৃতিক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পাশাপাশি দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রকেও তুলে দিতে চাইছে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট হাঙরদের হাতে। সেই উদ্দেশ্যই এই শিক্ষানীতি।

কর্পোরেটদের স্বার্থবাহী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য অনলাইন পঠন-পাঠনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে নয়া শিক্ষানীতিতে। সিলেবাস ছোটো করার নামে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক অধিকারকে বাতিল করার চক্রান্ত রয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় ৩ বছর থেকে টানা ১৮ বছর পর্যন্ত বিদ্যালয় কাঠামোর মধ্যে থাকা কঠিন হয়ে উঠবে ছাত্রছাত্রীদের। ফলে স্কুল ছুটের সংখ্যা বাড়বে। শিক্ষায় বৈষম্য বাড়বে। বেকার-যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের অভাব তাদের মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, জীবন শৈলী শিক্ষা, সাংস্কৃতিক মননে দারুণ প্রভাব ফেলবে। কাজেই সুদূরপ্রসারী আক্রমণাত্মক এই নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই। সেই পথ দেখিয়েছে দেশব্যাপী সফল সাধারণ ধর্মঘট। সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করেই আমাদের আন্দোলনের পথে যেতে হবে। এ কাজ শুধুমাত্র ছাত্র সমাজের নয়। দেশ রক্ষার স্বার্থে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। একটু অবাধ্য আমাদের হতেই হবে। সংগঠিত অবাধ্যতার ঢেউ তুলতে হবে ব্যাপকভাবে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের অভিনন্দন জানালেন সাধারণ সম্পাদক

পাওয়া সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক- শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা। বিগত দু'মাস যাবৎ এই অংশের মধ্যে ধর্মঘটের প্রচারের সময় যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছিল তার মধ্য দিয়ে এটা অনুভূত হয়েছিল যে ধর্মঘটের দাবিগুলি তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। ধর্মঘটের আগের দিন রাতের অন্ধকারে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী আদেশনামা প্রকাশ করে। এছাড়াও ঐদিন রাত থেকেই সর্বোচ্চ প্রশাসকের নির্দেশকে উপেক্ষা করে প্রশাসনে একাংশের অধস্তন আমলারা বহু কর্মচারীদের অফিসে হাজিরা দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রাজ্যজুড়ে সমস্ত হুমকি এবং কালা আদেশনামাকে উপেক্ষা করেই অধিকাংশ কর্মচারী ধর্মঘটকে সমর্থন এবং সফল করেছেন। এই কারণে সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং ধর্মঘট সমর্থনকারী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতা-কর্মীরা শাসকের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েও যেভাবে ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নেমে জানকবুল লড়াই করেছেন তার জন্য তাঁদের রক্তিম অভিনন্দন জানাই। সর্বোপরি এই ধর্মঘটের সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার রাজ্যের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানাই অভিনন্দন। সর্বভারতীয় ধর্মঘটের এই সাফল্য আগামী দিনে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের মঞ্চ প্রস্তুত করবে। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

দেশজ সম্পদ বিক্রির অভিযান বন্ধ হোক

ভারতের আর্থিক সার্বভৌমত্ব (এখনও যেটুকু আছে) রক্ষার অন্যতম প্রধান দুটি ক্ষেত্র হলো ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্র। নয়া উদারনীতির প্রভাব এই দুটি ক্ষেত্রেও পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই ১৪টি বেসরকারী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। এর আগে প্রচুর বেসরকারী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ফলে অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর থেকে একটি ব্যাঙ্কও দেউলিয়া হয়নি। উপরন্তু বেশক'টি দেউলিয়া ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত করে দিয়ে সেই ব্যাঙ্কগুলির আমানতকারীদের রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নানাবিধভাবে উদারনীতির আক্রমণ শুরু হবার বিশ দশক পরেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। একই কথা প্রযোজ্য বীমা ক্ষেত্রেও। ১৯৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর বীমা ক্ষেত্র জাতীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থা দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অন্যতম ভিত্তি হিসাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রের মতোই নয়া উদারনীতির করাল গ্রাসের কবলে বীমা ক্ষেত্রেও। উভয়ক্ষেত্রেই বর্তমানে ৪৯ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দেশের আর্থিক ক্ষেত্র মজবুত করার পাশাপাশি কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রেও এই দুটি ক্ষেত্র যে ভূমিকা পালন করতো আজ তা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবিটিকে ১৯৯১ থেকে আজ পর্যন্ত (২৬ নভেম্বর ২০২০) যে ২০টি সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে তার সবক'টিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধারাবাহিক এই লড়াই সংগ্রামের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে পুরোপুরি দেশী-বিদেশী কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে পারেনি। তবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় সরকার এক্ষেত্রে আরও বেপরোয়া হবে তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা সচেতন থেকে লড়াই জারী রেখেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রায় সবাই এই প্রসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আছে। মোদীজির "আত্মনির্ভর ভারত অভিযান"-এর আড়ালে দেশের সম্পদ বিক্রির অভিযান ব্যর্থ করতে একজোট হতে হবে আমাদের সবাইকে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

দেশে বিদেশে নভেম্বর বিপ্লব উদ্‌যাপন

মাল্যদান, পতাকা উত্তোলন করেন ও সবাই কিছুক্ষণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। লাল পতাকা নিয়ে সুসজ্জিত মিছিল, মিটিং ও বিভিন্নরকমের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মহান দিনটিকে উদ্‌যাপন করেন। এছাড়াও চীনসহ আরো সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও একইভাবে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে এই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে দেশের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে।

এই করোনা আবহে আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য রাজ্য কেরালা একটা বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছে, কেরালা সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে করোনা মোকাবিলায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করেই ৭ নভেম্বর শনিবার রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়েছে। এছাড়াও কর্ণাটকে উদ্‌যাপিত হয়েছে যথাযথ মর্যাদায়। পতাকা উত্তোলন করে, শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে ও লেনিন, স্তালিনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। নভেম্বর বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদির আমূল উন্নতির বিষয়গুলি তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন।

আমাদের রাজ্যেও ৭ নভেম্বর শনিবার গ্রাম শহরের বুকে বুকে মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে প্রতিপালিত হয় এবং কোভিড-১৯-এর সবরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদিতে মাল্যদান সহ এই দিনটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা, বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়। নেতৃত্বরা ব্যাখ্যা করেন এই মহান নভেম্বর বিপ্লব শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রকেই বিকশিত করেনি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তন করে কিভাবে একটা রাষ্ট্রকে বিশ্বের সামনের সারিতে দাঁড় করিয়েছিল।

২০২০ সালের এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এবং এত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে দেশে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস সাক্ষী তীব্র নেতিবাচক ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। এই পৃথিবীতে শোষণ বঞ্চনা নিপীড়ন যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের মুক্তির সংগ্রাম অনির্বাণ শিখার মতো প্রজ্জ্বলিত থাকবে। এই মহান নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শ ও স্বপ্নকে সামনে রেখে একটি সফল সংগ্রাম ঘটে গেছে গত ২৬ নভেম্বর—'বিশতম সাধারণ ধর্মঘট'। দেশের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধর্মঘটে সামিল হয়ে সফল করেছে, যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

২৬ নভেম্বর অভূতপূর্ব সফল সাধারণ ধর্মঘট

নিয়েছেন। দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিমাক্ষেত্র পুরো বন্ধ, ব্যাঙ্কও ৮০ শতাংশের বেশি বন্ধ ছিল। সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরেও এদিনের ধর্মঘটের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। নির্মাণ শ্রমিকরা কাজ করেননি দেশজুড়েই। নয়ডা, ফরিদাবাদ, গাজিয়াবাদ-এর মতো শিল্প এলাকায় কঠিন সঙ্কটে থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে সাত শতাধিক নির্মাণ শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিড়ি শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখেছেন। সড়ক পরিবহনে বেসরকারী ক্ষেত্রেও ধর্মঘট হয়েছে। অনেক রাজ্যে রাস্তায় চলেনি ট্যাক্সি, অটো। চা সহ বাগিচা শ্রমিকরা সংগঠিতভাবেই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। আই সি ডি এস, আশা কর্মীদের মতো প্রকল্প কর্মীরা দলে দলে ধর্মঘট করেছেন। আইন অমান্যে অংশ নিয়েছেন। লক্ষ্যণীয়ভাবে এবারের ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন দোকান কর্মীরা। দেশজুড়ে ছোটো দোকানদারদের বিরাট অংশই এই ধর্মঘটে সমর্থন করায় বাজার এলাকা শুনশান হয়ে যায়। মুটিয়া মজদুররা ধর্মঘটে অংশ নেওয়ায় বৃহৎ বাজার, মান্ডি, পাইকারি বাজারে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

লকডাউনে গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক মেহনতী মানুষকে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়ার পরিবর্তে দেশের সরকার পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সংসদে সংখ্যাধিক্যের জোরে কৃষি আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনটি নতুন কৃষি আইন লাগু করে যার মধ্য দিয়ে দেশের আপামর কৃষক সমাজ আক্রান্ত হবে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের কেন্দ্রীয় কৃষক সংগঠন ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলি ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গ্রাম-ভারত স্তব্ধ করার যে আহ্বান জানিয়েছিল গোটা দেশের কৃষক সমাজ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ধর্মঘটের আগের দিন ২৫ নভেম্বর রাতে পাঞ্জাব, রাজস্থানে লক্ষাধিক কৃষক দিল্লী অভিমুখে লঙ মার্চ শুরু করে। হরিয়ানার বিজেপি সরকারের পুলিশ পাঞ্জাব-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষকদের এই শান্তিপূর্ণ অভিযানকে আটকানোর জন্য পাশমিক দমন-পীড়ন চালায়। উত্তর ভারতের প্রচণ্ড শীতের রাতে হরিয়ানার পুলিশ কৃষকদের উপর যথেচ্ছভাবে জলকামান ব্যবহার করে। কিন্তু এই দমন পীড়নে পিছু না হটে কৃষকরা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে ধর্মঘটকে সফল করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। একই সময়ে শ্রমিক ও কৃষকদের এরকম যৌথ ও স্বাধীন লড়াই-সংগ্রাম বহুদিন পর দেশের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নয়া ইতিহাস রচনা করলো।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও শাসকের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করেই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, ত্রিপুরা, আসামের মতো রাজ্যগুলিতেও ব্যাঙ্ক, বীমা, ডাক সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের কর্মীরা ধর্মঘটে শামিল ছিলেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও অংশগ্রহণ করেন ধর্মঘটে। বৃহস্পতিবার শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় এই রাজ্যগুলির শিল্পাঞ্চলও ছিল স্তব্ধ। এই রাজ্যগুলির অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড ডে মিল, রেগা সহ বিভিন্ন প্রকল্প কর্মীরাও অংশ নিয়েছেন ধর্মঘটে। কর্ণাটকে ৮০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। শিল্প তালুক বেল্লারির কয়লা খাদান সহ মেঙ্গালুরু বন্দরে কাজ হয়নি। বস্ত্র ও সুতো শিল্পেও উৎপাদন বন্ধ ছিল। হিমাচল প্রদেশ-এ এই প্রথম একসঙ্গে চার হাজারের বেশি চালক ও কন্ডাক্টর কাজে যোগ দেননি। রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প তালুকের শ্রমিক-কর্মচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মীরাও অংশ নিয়েছিলেন ধর্মঘটে। হরিয়ানায় পুলিশের দমন পীড়নের মধ্যেও বেনজির ধর্মঘট হয়। রোহতক, হিসার, মানালি, আম্বালা, সোনেপথ, পানিপথের মতো বড় বড় শহরে বিশাল মিছিল বের করেন ধর্মঘটীরা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পতালুকের শ্রমিকদের সঙ্গে এই মিছিলে শামিল হয়েছিলেন প্রকল্প কর্মীরা, ইটভাটার শ্রমিক, অটো রিকশা চালক, নির্মাণ শ্রমিক। আসামে পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ ছিল। ডিগবয় তেল শোধনাগারে ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পরে। রাজ্যে এল পি জি-র ছয়টি ফিলিং প্ল্যান্ট ও চারটি টার্মিনাল প্ল্যান্ট পুরোপুরি বন্ধ ছিল। শিলচরের ও এন জি সি'র রিজিওনাল কার্যালয় পুরোপুরি বন্ধ ছিল। দুশোর বেশি চা-বাগানের শ্রমিকরা ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। গুজরাটে রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার শিল্প শ্রমিক, বন্দর শ্রমিক, গ্রামীণ ডাককর্মী, বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মী, কাস্টিং শিল্পের শ্রমিকরা সরাসরি ধর্মঘটে অংশ নিয়ে পথে নেমে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। এদিন ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন বস্ত্র শিল্প ও পাওয়ার লুমের শ্রমিকরা। ধর্মঘট বানচাল করতে ২৫ নভেম্বর রাতের দিকে রাজ্য সরকারী কর্মীদের জন্য নির্দেশিকা জারি করে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। যাতে বলা হয় সরকারী কর্মীরা ৬ মাসের জন্য ধর্মঘটে যেতে পারবেন না। তারপরেও বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন কর্মীরা। ত্রিপুরায় ধর্মঘটে সর্বাত্মক সাড়া দেখে শাসকদলের পক্ষ থেকে বাহিনী নামিয়ে আক্রমণ, ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তর ভাঙচুর চালানো হয়। একাধিক জায়গায় ধর্মঘটের ছবি তোলায় সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এত আক্রমণের পরেও রাজ্যের সর্বত্র দোকান বাজার বন্ধ ছিল। যানবাহন কার্যত চলেনি।

এসমা জারি করেও ওড়িশা সরকার ধর্মঘটকে ভাঙতে পারেনি। কটক থেকে খুরদা, রৌরকেল্লা থেকে ভদ্রক ধর্মঘটে অচল ছিল গোটা রাজ্য। ভুবনেশ্বর, কটক, রৌরকেল্লা, সম্বলপুর, বেগমপুর, বালেশ্বর, রায়গড়া, পারাদ্বীপ সর্বত্রই মেহনতী মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে যোগ দেন। দীর্ঘ সময় ধরে চলা অবরোধে পরিবহন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র পরিবহন সহ পরিষেবা ক্ষেত্রে যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা জমায়েত শুরু করেন। অধিকাংশ জেলায় দোকান বাজার ছিল বন্ধ। রাস্তায় নামেনি সরকারী ও বেসরকারী পরিবহনও, এদিন ধর্মঘটে সি আই টি ইউ এবং কৃষকসভা মিলে ৫০ হাজারের বেশি কর্মী-সমর্থক প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। হরতালে শামিল হয়ে জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকাতেও বিজেপির ধ্বংসাত্মক নীতির অন্যতম ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ শ্রমিক কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কৃষক ও শ্রমিক বিরোধী নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সমস্ত নাগরিকের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক অধিকারের উপর দেশের শাসকদলের অহরহ আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন উপত্যকাবাসী। ছত্তিশগড়েও কৃষক মজদুর একজোট হয়ে ধর্মঘট সফল করেছেন। প্রত্যন্ত আদিবাসী বসতি এলাকাগুলিতেও ধর্মঘট দারুণ সাড়া ফেলে দেয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পথে নামেন শ্রমিক-কৃষকরা ফলে একাধিক জেলা শ্রমিক বিক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘূর্ণীঝড় নিবরে প্রভাবিত চেন্নাই সহ ১৩ জেলা বাদে অন্যত্র শ্রমিক, কর্মচারী সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন তামিলতাড়ুতে। গোটা রাজ্যের ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিক কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দেন। রাজস্থানে খেতরির তামাখনির ৮৫ শতাংশ শ্রমিকই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্যের সমস্ত বড় বড় কাপড়ের মিল, আনাজমান্ডি, ফলমান্ডিতে এদিন কোনো কাজ হয়নি। গোটা রাজ্যজুড়েই হয়েছে বিক্ষোভ আন্দোলন। ব্যাঙ্ক-বীমা, কেন্দ্রীয় দপ্তর সর্বত্রই ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ৫০ লক্ষের বেশি শ্রমিক-কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এদিনের ধর্মঘটে। মুম্বাইসহ গোটা মহারাষ্ট্রেই সাধারণ ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পরে। সোলাপুরে বিড়ি শ্রমিক, পাওয়ার লুম শ্রমিকরা এদিন কাজে যোগ দেননি। নাসিক-থানে,-পালঘর সহ রাজ্যের বহু জায়গাতেই কৃষক ও ক্ষেতমজুরেরা শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে একযোগে রাস্তা রোকো কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যাঙ্ক, বীমা, সরকারী কর্মচারী সহ শিল্পাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী এবং নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ পরিচারিকা, আশা-অঙ্গনওয়াড়ির মতো প্রকল্প কর্মীরাও ধর্মঘট সফল করতে রাস্তায় ছিলেন দিনভর। এক কথায় নয়া ইতিহাস রচনা করলো এদিনের ধর্মঘট। □

দেবাশিস রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সফল হলো কৃষকদের ডাকা ভারত বন্ধ

এদিন প্রত্যাশিতভাবেই পাঞ্জাব, হরিয়ানা হরতালে অচল হয়ে যায়। জীবনযাত্রা পুরো স্তব্ধ। গ্রামে গ্রামে মিছিল, সড়কজুড়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্লোগান দিয়েছেন, গান গেয়েছেন। পাঞ্জাবের ৫০ হাজার সরকারি কর্মী ধর্মঘটের সমর্থনে গণ ছুটি নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার অবৈধ আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল। এদিকে ধর্মঘট আটকাতে বিরোধী নেতা-নেত্রীদের ঘরবন্দী করে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ধর্মঘট আটকাতে পারেননি। তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ওড়িশায় ৯০ শতাংশ জীবনযাত্রা অচল হয়ে যায়। মহারাষ্ট্রজুড়ে কৃষক অবরোধ হয়েছে। মুম্বাই সহ বড় শহরে দোকানপাট খোলেনি। বিহারে ধর্মঘটকারীরা রাস্তায় নেমেই ধর্মঘট সর্বাত্মক করেছেন। ত্রিপুরায় শাসকদলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই ধর্মঘটে অচল হয়েছে রাজ্য। কেরালায় স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন থাকায় রাজ্যব্যাপী বন্ধ হয়নি, কিন্তু প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল গোটা রাজ্য। আসাম, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে মানুষ পথে নেমেছেন কৃষকদের সমর্থনে। ছত্তিশগড়ে দোকানপাট, অফিস বন্ধ ছিল, যানবাহন চলেনি। রাজস্থানে শুধু হরতালই হয়নি, সেই রাজ্য থেকে নতুন করে কৃষকদের দল আসতে শুরু করেছে দিল্লির দিকে। অবরুদ্ধ দিল্লিতে রাস্তাঘাট ছিল শুনশান, সামান্য কিছু অটো ছাড়া পরিবহন ব্যবস্থা ছিল অচল। দিল্লির শিল্পাঞ্চল ও জনবসতি এলাকায় এদিন ছিল মিছিলে মিছিলে অবরুদ্ধ। কর্ণাটকেও জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত।

ধর্মঘটের সমর্থনে কৃষিপণ্যের চলাচল এদিন প্রায় পুরোই বন্ধ ছিল, পণ্যবাহী ট্রাক চলতে দেখাই যায়নি দেশের বিস্তীর্ণ প্রান্তে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষত আদিবাসী এলাকায় অজস্র মিছিল হয়েছে এদিন। নির্মাণকর্মী, পাথর খাদান, কলকারখানার শ্রমিক থেকে ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন এই কৃষক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শ্রমিক-কৃষক ঐক্য আরও দৃঢ় হলো এদিনের এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে যা প্রত্যক্ষ করল গোটা দেশের মানুষ।

এদিনের ধর্মঘটে আমাদের রাজ্যেও শ্রমজীবী ঐক্যের এক নতুন রূপ দেখা গেল। বারো দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার ধর্মঘট সফল করে এ রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুব-মহিলারা রচনা করলেন নতুন ইতিহাস। বাংলায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বর্তমান রাজ্য সরকারও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মেজাজ দেখে ধর্মঘটের দাবির প্রতি নৈতিক সমর্থনের কথা বলে ধর্মঘট ভাঙতে পথে পুলিশ নামাননি। জেলায় জেলায় ধর্মঘটের সমর্থনে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। গ্রাম-শহরে দোকানবাজার প্রায় সবটাই বন্ধ ছিল। গণপরিবহন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ব্যাপক রেল রোকো হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। এক কথায় এ সময়কালের সব থেকে শান্তিপূর্ণ ও সর্বাত্মক ধর্মঘট এদিন আমাদের রাজ্যে সংগঠিত হয়েছে শাসকদল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে হিংসাত্মক আক্রমণের ঘটনা না ঘটায়।

দেশজোড়া কৃষক শ্রেণীর পক্ষ থেকে আহূত এদিনের ধর্মঘট সত্যিই কৃষক-শ্রমিক-মেহনতীর ঐক্যের এক নতুন ইতিহাস রচনা করল। □

দেবাশিস রায়

২৬ নভেম্বরের দেশজোড়া ধর্মঘট পশ্চিমবঙ্গেও সফল

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ২৬ নভেম্বর এক অভূতপূর্ব ধর্মঘটের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গও। পুলিশের লাঠি চার্জ, গ্রেপ্তারি এবং তৃণমূল বাহিনীর হামলা সত্ত্বেও জনগণের ব্যাপক সমর্থনে গোটা রাজ্যেই এই ধর্মঘট তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে ডাকা আগের ধর্মঘটগুলির থেকে আরও অনেক বেশি সফল হয়েছে। সাধারণ মানুষ

ধর্মঘটের দাবিগুলির সঙ্গে নিজেদের জীবনযন্ত্রণার মিল খুঁজে পেয়েছেন বলেই ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। ধর্মঘটকে কার্যকরী করতে বদ্ধপরিকর জনগণের মেজাজ দেখে পিছু হঠতে বাধ্য হয় পুলিশ এবং তৃণমূল বাহিনী। শত চেষ্টা করেও ধর্মঘটকে রুখতে না পেরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ধর্মঘট সমর্থন করি না, কিন্তু দাবিগুলোকে নৈতিকভাবে সমর্থন করি"।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ও কর্পোরেট তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ৭ দফা দাবিতে ওইদিন সারা দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। করোনাজনিত পরিস্থিতির জন্য গত ২ অক্টোবর 'ভার্চুয়াল' পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির জাতীয় কনভেনশন থেকে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আহূত এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম, প্রতিরক্ষা সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি। পাশাপাশি কৃষক সংগঠনগুলিও কৃষি আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে গ্রাম ভারতে তাঁদের দাবিতে বিক্ষোভ-অবরোধের ডাক দেন। ছাত্র-যুব-মহিলা সহ অন্যান্য গণসংগঠনগুলিও নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে ধর্মঘটকে সমর্থন করে। সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে এবং অ্যাফিলিয়েটেড রাজ্য ভিত্তিক সংগঠনগুলির কাছে স্ব স্ব রাজ্যের প্রশাসনের অভ্যন্তরে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানায়। পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ বিভিন্ন বোর্ড কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের আবৃত করা সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং যুক্ত কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল ও স্টিয়ারিং কমিটি—এই চারটি সংগঠনেরই সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েশন আছে। তাই সাতটি জাতীয় দাবির সাথে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দুটি দাবি যুক্ত করে এই চারটি সংগঠন রাজ্য প্রশাসন সহ রাজ্য সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের এই ধর্মঘটে শামিল করার জন্য যৌথভাবে উদ্যোগ নেয়। গত ৯ নভেম্বর এই চারটি সংগঠন একসাথে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করে। ওইদিনই জেলা শাসকদের কাছে নোটিশের অনুলিপিও প্রদান করা হয়।

২৬ নভেম্বর সকাল থেকেই কলকাতা ও জেলাগুলির অজস্র জায়গায় মিছিল এবং রাস্তা অবরোধে শামিল হন ধর্মঘটের সমর্থকরা। এইদিন কলকাতায় এন্টালি থেকে মল্লিক বাজারে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ-র রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু সহ ধর্মঘটের আহ্বানকারী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ। ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সভার কর্মীদের পাশাপাশি বামপন্থী ও সহযোগী দলগুলিও নিজেদের পতাকা নিয়ে একসঙ্গে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করেন বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতার যাদবপুর, মৌলালি, মল্লিকবাজার, সেন্ট্রাল এভিনিউ, রাজাবাজার, ফুলবাগান ও আরও কয়েকটি জায়গায় সকাল থেকেই পথ অবরোধ করেন ধর্মঘট সমর্থকরা। জেলাগুলিতেও সকাল থেকেই ধর্মঘটীরা মিছিল করেন এবং রাস্তা এবং রেল অবরোধ করেন। কলকাত ও শহরতলিতে রেল অবরোধের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও সড়ক অবরোধ করা হয়। শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনে ট্রেন চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ট্রেনের যাত্রী সংখ্যাও ছিল খুবই কম। হাওড়া-বর্ধমান লাইনে হুগলী জেলার ২০টি স্টেশনে রেল অবরোধ করা হয়। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় অবরোধের ফলে সকাল থেকেই ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। শিয়ালদহ উত্তর শাখাতেও বিভিন্ন স্টেশনে রেল অবরোধ করা হয়।

রাজ্যের বহু জায়গায় বামপন্থী ও সহযোগী দলগুলির পতাকা সহ মিছিল ও অবরোধকারীদের ওপর পুলিশ এবং তৃণমূল বাহিনী হামলা চালায়। বেশ কিছু জায়গায় ধর্মঘটের বিরোধিতা করে মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি-র থেকে তাদেরই বেশি তাগিদ ছিল ধর্মঘটকে রোখার। বহু জায়গায় তৃণমূল বাহিনী জমায়েত করে জোরজবরদস্তি দোকান-বাজার ও অফিস খুলতে পর্যন্ত বাধ্য করে। দমদমে ধর্মঘট সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল বাহিনী। বীরভূমের ইলামবাজারে ধর্মঘট সমর্থকদের আক্রমণ করে পুলিশ। খড়্গপুরে রেলপুলিশের (আর পি এফ) সঙ্গে একত্রে অবরোধকারীদের ওপর হামলা চালায় রাজ্যের পুলিশ। বেলঘড়িয়ার রথতলায় বাম ও কংগ্রেসের অবরোধকারীদের ওপর পুলিশি হামলায় কয়েকজন আহত হন। তৃণমূল বাহিনী টেক্সম্যাকো কারখানা, আগরপাড়া ও বরানগর জুটমিলে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। বারাসতের কলোনি মোড় ও হেলাবটতলা মোড়ে অবরোধকারীদের সরানোর জন্য পুলিশ ও র‍্যাফ বেধড়ক লাঠিপেটা করে। লাঠির ঘায়ে অনেকে আহত হন। দুর্গাপুরের ডি ভি সি মোড়ে পুলিশ অবরোধকারীদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চালায় এবং তাঁদের গ্রেপ্তারও করে। বাঁকুড়ার বড়জোড়াতেও বহু ধর্মঘট সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুধু কলকাতাতেই প্রায় দেড়শো জন ধর্মঘট সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সারা রাজ্যে এক হাজারেরও বেশি ধর্মঘট সমর্থক গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু পুলিশ জানায় যে পাঁচশোর কিছু বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়ে গোটা রাজ্যেই। কর্মস্থলগুলিতে হাজির ছিল খুবই কম। কলকাতায় সরকার জোর করে বাস চালালেও যাত্রী সংখ্যা ছিল নগণ্য। জেলাগুলিতেও গণপরিবহন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাঁদনি চক ও সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে ধর্মঘটের সমর্থনে পিকেটিং করা হয় এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় ধর্মঘট সমর্থকদের। লকডাউনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটকে সমর্থন করে বহু জায়গায় দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। কলেজ স্ট্রীট এলাকা এদিন কার্যত জনশূন্য ছিল এবং দোকানপাট বন্ধ ছিল। বড়বাজার এলাকায় স্থানীয় দোকানদার, ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ী, মুটে-মজদুর থেকে বিভিন্ন পেশার শ্রমিক-কর্মচারী—সকলেই ধর্মঘটকে সফল করতে এককাট্টা ছিলেন। ব্যাঙ্ক, বিমা, বি এস এন এল ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। রাজ্য সরকার ধর্মঘটের আগের দিন রাতে হুমকি দিয়ে নির্দেশিকা জারি করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারী অফিসগুলিতে এবারের ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলিতেও ধর্মঘটের অভূতপূর্ব প্রভাব পড়ে। এবারের ধর্মঘটে সারা দিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরাও। এদিন সেক্টর ফাইভে বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার অফিসগুলিতে

হাজিরা ছিল নামমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের বড়ো শিল্পগুলিতেও হাজিরা ছিল খুব কম। হলদিয়া থেকে মহেশতলা, চকচকা থেকে নৈহাটি, চাঁপদানি—সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটে শামিল হলেন শ্রমিকরা। কারখানাগুলির গেটে গেটে ছিল পিকেটিং। কোথাও রাস্তা অবরোধ, কোথাও অবস্থান করেন শ্রমিকরা। প্রতিটি শিল্পাঞ্চলেই টোটো, বাস ও রিকশা চালকরাও ধর্মঘটের সমর্থনে কারখানার শ্রমিকদের পাশে থাকেন।

ধর্মঘটের দিন গ্রাম বাংলাকে প্রায় স্তব্ধ করে দিয়ে আগামী দিনে আরও বড়ো আন্দোলনে নামার শপথ নিলেন পশ্চিমবাংলার কয়েক লক্ষ কৃষক, খেতমজুর ও তাঁদের পরিবার। পুলিশ ও শাসকদলের হুমকিকে উপেক্ষা করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় চারশো জায়গায় মিছিল ও অবরোধ করে এবং পুলিশের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে কর্পোরেট এবং বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে আনা নতুন কৃষি আইন তাঁরা মেনে নেবেন না। গ্রামেগঞ্জে কৃষক ও খেতমজুররা এদিন চাষের কাজে মাঠে নামেননি। জেলে ও মৎস্যচাষিরাও মাছ ধরার জন্য পুকুর বা ভেড়িতে নামেননি। গ্রামে গ্রামে দোকানপাটও বন্ধ ছিল। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতেও কাজ প্রায় হয়নি। চা বাগানের মজদুররা শুধু তাঁদের বাগানে পিকেটিং করে ও ধর্মঘটের মিছিলের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। বহু জায়গায় তাঁরা সরাসরি অংশ নিয়েছেন রাস্তার লড়াইতেও। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা আটকে দিয়েছেন ট্রেন, আটকে দিয়েছেন জাতীয় ও রাজ্য সড়ক। চা বাগান লাগোয়া গ্রামীণ অঞ্চলেও ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক।

সর্বাত্মক ধর্মঘটের এমন চেহারা বহুদিন পরে দেখা গেল রাজ্যে। জনমত যে ধর্মঘটের পক্ষে আছে তা মুখ্যমন্ত্রীরও বুঝতে দেরি হয়নি। তাই তিনি নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ধর্মঘটের দাবিগুলির প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। কিন্তু বিজেপির সঙ্গলাভের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় তিনি ধর্মঘটের বিরোধিতা করেন। ধর্মঘটকে রোখার জন্য এ রাজ্যের প্রশাসনিক সক্রিয়তা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রশাসনিক ভাবে ধর্মঘটকে আটকানোর চেষ্টা করে মুখ্যমন্ত্রী আবার দিল্লিগামী কৃষক মিছিলের ওপর আক্রমণ নিয়ে সরব হন। মুখ্যমন্ত্রীর এই দ্বিচারিতা পশ্চিমবাংলার মানুষকে তাঁর মুখোশটাকেই চিনে নিতে সাহায্য করবে। □

জরুরী তিন দফা দাবিতে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ

গত ৭ ডিসেম্বর '২০২০ গোটা রাজ্যজুড়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবিতে প্রতিটি রাজ্য সরকারী দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন সরকারী কর্মচারীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক তথা জনস্বার্থ বিরোধী কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে কৃষক-খেতমজুরদের ন্যায্য আন্দোলনের স্বপক্ষে এবং এই আন্দোলনের উপর পুলিশি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে, কলকাতায় এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে লাগাতার অবস্থান আন্দোলনের উপর রাজ্য সরকারের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার অধিকার রক্ষার স্বপক্ষে—মূলত এই তিনটি দাবিকে কেন্দ্র করে এই বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়।

সভাগুলিতে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের উপর বিজেপি সরকারের চরম নিপীড়ন মূলক আচরণের বিরুদ্ধে এবং কৃষক সমাজের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে না নেওয়ার অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়। দেশের সবক'টি কৃষক-খেতমজুরদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলির আহ্বানে ৮ ডিসেম্বর '২০ যে ভারত বন্ধ প্রতিপালিত হবে তার প্রতি

সংহতি ও সমর্থনের আহ্বান জানানো হয় সভাগুলি থেকে।

কলকাতায় সম্প্রতি এস এস সি উত্তীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদিন নিয়োগ না হওয়া যুবক-যুবতীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের দাবিতে লাগাতার অবস্থানের উপর মাঝরাতে রাজ্য সরকারের পুলিশ নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে সেই অবস্থান জবরদস্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয় এই সভাগুলিতে। অবিলম্বে হবু শিক্ষকদের নিয়োগ করার দাবিও জোরালো ভাষায় উত্থাপন করা হয়।

সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শাসকদলের অনুগামী কতিপয় কর্মচারী এবং রাজ্য প্রশাসনের কিছু আমলাদের নিয়ে নবান্নে একটি বৈঠক করেন যা সমস্ত ধরনের নিয়মকানুন বিরোধী। তার লাইভ সম্প্রচারও করা হয় গণমাধ্যমে। শাসকদলের পেটোয়া কর্মচারীরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে 'দিদি'-কে পুনরায় ক্ষমতায় আনার মতো রাজনৈতিক কথাবার্তাও বলেন। যে ধরনের কথা বলার অধিকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সার্ভিস রুলস-এ নেই সেই সব কথা মুখ্যমন্ত্রী ও উচ্চস্তরের আমলাদের সামনে প্রকাশ্যে বলেন তারা।

এই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানুয়ারি ২০২১ থেকে কর্মচারীদের জন্য ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে। ১/১/২০১৬ থেকে এফেক্ট দিয়ে ১/১/২০২০ থেকে ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর হয় মহার্ঘভাতা শূন্য ভাবে। উপরন্তু বাড়িভাড়া ভাতা ৩ শতাংশ কমিয়ে দিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়। দুটি ঘটনাই অভূতপূর্ব। তাই ১/১/২০২১ থেকে ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা হিসেবে যেটা বৃদ্ধি পাবে সেটা বাড়তি কোনো পাওনা বলে কর্মচারীরা আদৌ মনে করছেন না। দ্বিতীয়ত এই ডি এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার অর্জিত ও স্বীকৃত অধিকার পুনরায় অস্বীকার করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় হারে কর্মচারীদের ডি এ বকেয়া ২১ শতাংশ। বকেয়ার বিন্যাস হলো—১/৭/২০১৬—২ শতাংশ, ১/৭/২০১৭—১ শতাংশ, ১/১/২০১৮—২ শতাংশ, ১/৭/২০১৮—২ শতাংশ, ১/১/২০১৯—৩ শতাংশ, ১/৭/২০১৯—৫ শতাংশ এবং ১/১/২০২০—৪ শতাংশ। শেষ কিস্তিটি কোভিডজনিত কারণে কার্যকরী হয়নি। রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে চাইত তাহলে বকেয়া প্রথম দুই কিস্তি বাবদ মোট ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করত। তা না করে মুখ্যমন্ত্রীর ৩ শতাংশ ঘোষণা মানে হলো ওনার যা ইচ্ছা তাই দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের এই মনোভাবে বিরুদ্ধে কর্মচারীদের তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে আজকের প্রতিটি সভায়। এই সরকার আজ পর্যন্ত যেটুকু মহার্ঘ ভাতা দিয়েছে তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ধারাবাহিক কর্মচারী আন্দোলনের চাপেই দিতে বাধ্য হয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই কর্মচারীরা শপথ গ্রহণ করেছেন অর্জিত অধিকার রক্ষায় আগামী দিনে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হবেন তাঁরা।

এই বিক্ষোভ সভায় কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা ও ব্লকে কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব। কলকাতার উল্লেখযোগ্য অফিসগুলি, যেমন মহাকরণ, নব মহাকরণ, খাদ্যভবন, বাণিজ্য কর দপ্তর, স্বাস্থ্য ভবন, বিকাশ ভবন, ভবানী ভবন, পি এস সি দপ্তর, বি জি প্রেস দপ্তর প্রমুখ অফিসগুলিতে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। □

দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা

২৫ নভেম্বর, ২০২০। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকা সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ঠিক আগের দিন। সেদিন কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মঘটের সমর্থনে ট্যাবলো নিয়ে প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে দক্ষিণ কলকাতার ট্যাবলো প্রচারে যুক্ত হয়েছিলাম। বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রচার সেরে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন শরীরটায় সামান্য ক্লান্তি অনুভব করলেও, ঠিক পরের দিনের সুবৃহৎ রাজনৈতিক সংগ্রামের আগাম বার্তা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারার আনন্দে মনটা ছিল তরতাজা। শারীরিক ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও মনকে ছুঁতে পারেনি। বরং রাত পোহালেই শ্রমজীবী মানুষের জানকবুল লড়াইয়ের এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে—এটা ভেবে মনটা বেশ উত্তেজিতও। বাড়ির কাছাকাছি যখন প্রায় পৌঁছে গেছি, তখন দেখি ছাত্র-যুবদের একটা মিছিল সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে শ্লোগান দিতে দিতে এলাকা পরিক্রমা করছে। আমার পরিচিত এক কলেজ পড়ুয়া হাতে মাইক নিয়ে উদাত্ত গলায় বলছে, ‘সরফরোসি কি তমান্না অব হামারে দিল মে হ্যায় / দেখনা হ্যায় জোর কিতনা বাঁজু ইয়ে কাতিল মে হ্যায়।’ রামপ্রসাদ বিসমিলের লেখা এই কবিতা, যা ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, আজ শীতের সন্ধ্যায় কলকাতার রাস্তায় বর্তমান যুব প্রজন্মের কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি শুনে মনের মধ্যে ইতোমধ্যে জমে থাকা উত্তেজনার সাথে একরাশ আবেগও মিশে গেল।

এইসব অনুভূতি নিয়ে যখন সবেমাত্র বাড়ির চৌকাঠে পা রেখেছি, দরজা খুলেই আমার পুত্র বলল, ‘‘বাবা ফুটবলের ঈশ্বর আর নেই।’’

‘ফুটবলের ঈশ্বর’। না, নামটা ওকে বলতে হয়নি। আমারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ফুটবলের ঈশ্বর তো একজনই আমাদের কাছে—দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক থেকে পরম নাস্তিক হয়েও,‘ঈশ্বর’ শব্দটায় কানে কিন্তু কোনো খটকা লাগলো না। বরং মনে হলো, মারাদোনার নামের সাথে এটাই সব থেকে উপযুক্ত বিশেষণ। ফুটবল ‘সম্রাট’, ফুটবলের ‘রাজপুত্র’—এসব বলে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে হয়তো বা একজনের শ্রেষ্ঠত্বকে বোঝানো যায়, কিন্তু একই সাথে যিনি ক্যানভাসে দক্ষ শিল্পীর তুলির টানের মতো, সবুজ গালিচায় বাঁ পায়ে অনায়াসে ছবি আঁকেন, শরীরের মোচড়ে অবলীলায় ভেঙে দেন জার্মান প্রাচীর, উপার্জিত অর্থ শুধু নিজের ভোগের জন্য ব্যয় না করে দান করেন চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত আফ্রিকার শিশুদের জন্য, প্রবল পরাক্রমী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তীব্র সমালোচনা করতে যাঁর গলা কাঁপে না, শিশুর মতো উচ্ছ্বাসে যিনি ফিদেল কাস্ত্রোকে তাঁর দ্বিতীয় পিতা বলেন, যিনি বাহুমূলে সযত্নে এঁকে রাখেন চে গুয়েভারার ছবি—তাঁকে শুধুমাত্র রাজপুত্র বলে কি বোঝানো যায়? মারাদোনা নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও, মারাদোনাকে ঘিরে যে আবেগ তা কিছুটা যুক্তির বাঁধন ছিঁড়ে যদি তাঁকে তাঁরই বিশ্বাসের কল্পলোকে নিয়ে যায়, ক্ষতি কী? তাই ফুটবলের ঈশ্বর কথাটায় কোনো ব্যাকরণগত আপত্তির কথা তো মাথায় এলোই না, বরং আমিও পরক্ষণেই যখন আমার সহযোদ্ধা মানসকে (মানস কুমার বড়ুয়া) ফোন করে বললাম, ‘ফুটবলের ঈশ্বর চলে গেল’—কী আশ্চর্য, ওরও কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হলো না যে আমি মারাদোনার কথাই বলছি।

ছোটোবেলা থেকেই ফুটবল ও ক্রিকেট এই দুটো খেলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। তবে সমান আকর্ষণ ছিল না। পাল্লাটা ঝুঁকে থাকতো ফুটবলের দিকেই। আর একটা পার্থক্যও ছিল। ক্রিকেট মানে তখন আন্তঃদেশীয় টেস্ট ম্যাচ। গাভাসকার, বিশ্বনাথ, বেদী, চন্দ্রশেখরের পাশাপাশি ভিভিয়ান রিচার্ডস, গর্ডন গ্রিনীজ, লিলি, টমসন, জাভেদ মিঁয়াদাদ, ইমরান খানের ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যান তখন মুখস্থ। ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। অথচ ফুটবলের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। আন্তর্জাতিক ফুটবল মানে আমাদের কাছে তখন পেলে, ইওসোবিও, জোহান ক্রুয়েফ, বেকেনবাউয়ারের ফুটবল শৈলীর কথা কাগজে পড়া। মুগ্ধতা হয়তো ছিল। কিন্তু অন্তরের তেমন কোনো টান ছিল না। একবার ‘জায়ান্টস্ অফ ব্রাজিল’ সিনেমাটা দেখার সুযোগ হয়েছিল। পেলে, গ্যারিঞ্চার অপরূপ ড্রিবলিং, অসাধারণ গোল দেখে মনটা ভরে গেছিল। কিন্তু তবুও পেলে গ্যারিঞ্চা থেকে গেছিলেন দূর গ্রহের ফুটবলার হয়ে।

বরং কলকাতার ফুটবল, সুরজিৎ, সুভাষ ভৌমিক, মহঃ হাবিব—এদের ঘিরেই তখন যাবতীয় আবেগ। ফুটবল মানে তখনও আমাদের কাছে শুধুই ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান দ্বৈরথ। ১৯৭৬ সালে এলো সাদা-কালো দূরদর্শন। ১৯৭৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল। যার সেমিফাইনাল আর ফাইনাল লাইভ দেখার সুযোগ হলো দূরদর্শনের পর্দায়। নীল সাদা জার্সিতে সোনালী লম্বা চুলের কেম্পেসের বল নিয়ে লম্বা দৌড় আর গোল, সহযোগিতায় লুকে। চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা। ব্যস্ সমর্থক হয়ে গেলাম আর্জেন্টিার ফুটবলের। কিন্তু তখনও মূল আকর্ষণ ঘরোয়া ফুটবল। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, মজিদ বাসকর-জামশেদ নাসিরি। এলো ১৯৮২ সাল। আবার একটা বিশ্বকাপ ফুটবলের বছর। বিভিন্ন সংবাদপত্রের খেলার পাতায় আর্জেন্টিনার এক বিস্ময় প্রতিভাকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হলো। একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লেখা হলো, ঐ আর্জেন্টিনীয় খেলোয়াড়টি নাকি মাত্র একটা রুমালের আকারে জায়গার মধ্যে চারজন খেলোয়াড়কে অনায়াসে ড্রিবল করতে পারে। আরও লেখা হলো, কেম্পেস আর লুকের মতোই তিনি

সুমিত ভট্টাচার্য

আবারও আর্জেন্টিনীয়দের বিশ্বজয়ী করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। স্বভাবতই সবে আন্তর্জাতিক ফুটবলের স্বাদ পাওয়া আর্জেন্টিনার সমর্থক হিসেবে ঐ বিস্ময় প্রতিভাকে দেখার জন্য আগ্রহ তুঙ্গে উঠলো। কিন্তু সে বছরও শুধুমাত্র সেমিফাইনাল আর ফাইনাল দেখারই সুযোগ ছিল দূরদর্শনে। অথচ সে পর্যন্ত আর্জেন্টিনা পৌঁছোতেই পারলো না। ’৮২-র বিশ্বকাপে সকলকে পেছনে ফেলে নায়ক হয়ে উঠলেন ইতালির পাওলো রোসি। যিনি তার কিছুদিন আগেও জাতীয় দলে অনিশ্চিত ছিলেন। এই বিশ্বকাপে শুধুমাত্র দিয়েগো মারাদোনাই যে স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হলেন তা নয়। ব্রাজিলের সাদা পেলে নামে খ্যাত জিকো, ফ্রান্সের প্লাতিনি—এরা সকলেই ব্যর্থ হলেন। এলো ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ। ততদিনে অনেক ঘরেই রঙীন দূরদর্শন পৌঁছে গেছে। বিশ্বকাপ ফুটবলও দেখার সুযোগ পাওয়া গেল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব থেকেই। তার থেকেও বড় কথা, বিশ্বকাপের আগেই স্পোর্টস চ্যানেলে গভীর রাতে কখনও কখনও ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ফুটবল দেখার সুযোগ ঘটছে। ফলে ইওরোপের নামজাদা ক্লাব বার্সেলোনার জার্সি গায়ে দিয়েগো মারাদোনার ঝলক দেখারও সুযোগ কারও কারও হয়েছে। এক কথায়, ঘরে ঘরে বন্দনা শুরু না হলেও বহু মানুষের হৃদয়ে নায়কের আসনে ততদিনে বসে গেছে মারাদোনা। তাই ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ শুরুর আগেই সমস্ত ফুটবলপ্রেমীরা তখন মারাদোনাকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এমনকি ব্রাজিলের সমর্থকরাও। এবার আর দিয়েগো তাঁর আ-বিশ্ব সমর্থকদের নিরাশ করলেন না। নীতিদীর্ঘ শক্তপোক্ত চেহারার ১০নং নীল-সাদা জার্সির বাঁ পায়ের যাদুতে মোহিত হলো গোটা বিশ্ব। প্রবীণেরা বললেন, হ্যাঁ পেলের পরে দেখলাম বটে আর এক ১০ নম্বরকে। আর নবীন প্রজন্ম, যাঁরা পেলেকে দেখেনি, তারা বললো, তোমাদের পেলে আছে তো আমাদের মারাদোনা।

বিশ্বের কয়েক’শো কোটি ফুটবলপ্রেমী ভাগ হয়ে গেল দুটি শিবিরে—পেলে আর মারাদোনা। বিশেষজ্ঞরা কলম ধরলেন। কেউ এগিয়ে রাখেন মারাদোনাকে, কেউ বা পেলেকে। এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই সবুজ গালিচায় বাঁ পায়ের আউটস্টেপে বল রেখে নকশি কাথা বুনতে বুনতে মারদোনা তাঁর দেশকে পৌঁছে দিয়েছেন সেমিফাইনালে। সামনে ইংল্যান্ড, রেফারির চোখ এড়িয়ে বিতর্কিত ‘হ্যান্ড অফ গড’-এ প্রথম গোল। হয়তো এই গোলটা করে নিজেই বিবেকের দংশন অনুভব করেছিলেন। তাই প্রথম গোলের মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে নিজেদের অর্ধে বল ধরে শুরু করলেন স্বপ্নের দৌড়। বিশ্ব দেখল এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। ইংল্যান্ডের পাঁচ ডিফেন্ডার ছিটকে পড়লো। কেউ বাঁদিকে, কেউ বা ডানদিকে। সবশেষে পরাস্ত সেই সময় বিশ্বের এক নম্বর গোলকিপার পিটার শিলটন। শতাব্দীর সেরা গোলের ছবি আঁকলেন ফুটবলের রাজপুত্র। মারাদোনা নামক এক নেশায় বুঁদ হয়ে গেল ফুটবল দুনিয়া।

কিন্তু এতো গেল ফুটবলার মারাদোনার কথা। অদ্ভূত সমাপতন। ঐ সেমিফাইনাল ম্যাচ থেকেই মানুষ মারাদোনাকে চিনতে শুরু করলো সারা বিশ্ব। ম্যাচের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, ঐ ম্যাচ ছিল ফকল্যান্ডের যুদ্ধ। ব্রিটিশ উপনিরবেশবাদের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনীয়দের স্বাধীনতার লড়াই। এরপর ফাইনাল। জার্মানির বিরুদ্ধে মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতো মারাদোনার ডিফেন্স চেরা থ্রু থেকে বুরুচাগার গোল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলো আর্জেন্টিনা। আর পেলেকে বড়সড় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফুটবলভক্তদের মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়ে গেলেন মারাদোনা। ক্লাব ফুটবল খেলতে পাড়ি দিলেন ইটালি। কিন্তু সেখানে এসি মিলান বা ইন্টার মিলানের মতো বিশ্বসেরা ক্লাবে যোগ না দিয়ে, নাম লেখালেন মাঝারি মানের ক্লাব নাপোলিতে। মারাদোনার নেতৃত্বে নাপোলি হলো ইটালি সেরা ও ইউরোপ সেরা ক্লাব। জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি ও যশের সোপান বেয়ে যখন মারাদোনা উঠছেন, বাঁধনছেড়া জীবনের হাতছানিও তখন ধীরে ধীরে তাঁকে গ্রাস করছে। যার ছাপ পড়তে শুরু করলো খেলাতেও। ভারি হয়ে যাওয়া শরীরের কারণে হরিনের মতো ক্ষিপ্র গতি হ্রাস পেল। ধার কিছুটা কমলেও, ভারে তখনও মারাদোনাই। তাই ১৯৯০ সালে তাঁর কাঁধে ভর করেই আবার আর্জেন্টিনা পৌঁছে গেল বিশ্বকাপ ফাইনালে। কিন্তু এবার আর জার্মান প্রাচীর ভাঙা সম্ভব হলো না।

ফুটবলের যাদুকর মারাদোনা, ব্যক্তি জীবনের বেহিসেবী, অহরহই বিতর্কে জড়িয়ে পড়া মারাদোনা, মাদকাসক্ত মারাদোনা এই সময়ে সাক্ষাৎ পেলেন দুনিয়ার শোষিত মানুষের স্বপ্নের নায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির বলদর্পী মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ অবচেতনে তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিল, সেই ছোটোবেলায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় থেকেই। ফিদেলের সংস্পর্শে এসে তা স্পষ্টত বহ্নিমান হলো। তিনি ফিদেলের সাথে সাথেই আপন করে নিলেন ফিদেলের সহযোদ্ধা চে গুয়েভারাকে। চে গুয়েভারাকে স্থান দিলেন হৃদয়ে আর ফিদেলকে দ্বিতীয় পিতা সম্বোধন করে আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে নিলেন। এ এক অদ্ভুত সমাপতন। পিতা-পুত্র বিদায় নিলেন একই দিনে, ২৫ নভেম্বর, চার বছরের ব্যবধানে।

ফুটবল ঈশ্বরের শরীরী আসন শূন্য হলো। আর কেউ কি পারবেন এই জায়গাটা পূর্ণ করতে? গভীর সংশয়ে আবিষ্ট ফুটবল বিশ্ব। □

চলে গেলেন ১৯৮২-র বিশ্বকাপের নায়ক পাওলো রোসি

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।